কিন্তু স্বরাজের অর্থ কি ? স্ব অর্থ ব্যক্তি নিজে এবং রাজ অর্থ শাসন। ব্যক্তির নিজের উপরে নিজের শাসন। তিলক এবং পরবর্তীকালে গান্ধী স্বরাজের একই রকম ব্যাখ্যা করে বলেছেন : শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতা নয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং আধ্যাত্মিক (Spiritual), সব দিক থেকেই ব্যক্তি শৃঙ্খলমুক্ত হবে—সর্বপ্রকারে সে স্বনিয়ন্ত্রিত হবে। সুতরাং বলা যেতে পারে, বিবেকানন্দ এবং পরবর্তী চিন্তাবিদগণ পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সম্পর্কে ধারণার সঙ্গে ভারতের আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা সম্পর্কে ধারণার মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। কারন তাঁরা হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন Denis Dalton-এর ভাষায়, "উচ্চস্তরের আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা অর্জন করতে হলে মানুষের নিম্নস্তরের স্বাধীনতা থাকা প্রয়োজন।"[৩] ("Man must have freedom in the lower realms to achieve the spiritual freedom of the highest")।

তিলক হোমরুল আন্দোলনের লক্ষ্য স্বরাজ বা রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে কিভাবে আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনা (Spiritual connotation) দিয়েছিলেন, তা সংক্ষেপে বলা দরকার। তিলক 'গীতারহস্যে' লিখেছেন, "হোমরুল আন্দোলনের প্রাণ ছিল স্বাধীনতা ... এই স্বাধীনতাই হল ব্যক্তির আত্মার অন্তর্নিহিত শক্তি, যে আত্মাকে বেদান্ত অনুযায়ী ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না এবং যা ঈশ্বরেরই অঙ্গীভূত।"

অতএব স্বাধীনতা ব্যক্তির আত্মার অন্তর্নিহিত শক্তি এবং ঈশ্বরের থেকে অবিচ্ছিন্ন। সে কারণে স্বরাজ বা স্বাধীনতাকে অস্বীকার করলে একই সঙ্গে আত্মা এবং ঈশ্বরকে অসম্মান করা হয়। স্বরাজ ব্যক্তির ঐশ্বরিক অধিকার (divine right)। আগেই বলা হয়েছে, স্বাধীনতা আন্দোলন চলাকালীন বাল গঙ্গাধর তিলক এক কিংবদন্তী শ্লোগান রচনা করেছিলেন:

"স্বরাজ আমার জন্মগত অধিকার এবং আমি তা অর্জন করবই।"

স্বরাজের এই "জন্মগত অধিকার" স্বরাজের আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের বুঝে নিতে হবে।

৪১.৫.২ জাতীয়তাবাদ

তিলকের জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা মানুষের আধ্যাত্মিক একতা (Spiritual Unity of mankind) সম্বন্ধে বেদান্তের আদর্শ এবং মাৎসিনী, বার্ক, মিল ও উইলসন প্রভৃতি প্রচারিত পশ্চিমী জাতীয়তাবাদের মিলনে গড়ে ওঠে তিলকের জাতীয়তাবাদ সম্পর্কিত চিন্তাভাবনা। তিলক জানতেন, জাতীয়তাবাদের ভিত্তি বস্তুনির্ভর এবং ভাব-নির্ভর, উভয়ই (both objective and subjective)। একই ভাষা, ভূখন্ড ও ধর্ম জনসাধারণের মনে ভাব-নির্ভর একতাবোধের (subjective feeling of oneness) জন্ম দেয়। এই ভাব বা আবেগ-নির্ভর একতার অনুভূতিই জাতীয়তাবাদ বিকাশের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তিলকের বিশ্বাস ছিল, পতাকা, প্রতীক এবং সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসব প্রভৃতির মাধ্যমে যদি জনগণের অন্তর্নিহিত একতাবোধকে জাগ্রত করা যায় তাহলে জাতীয়তাবাদকে শক্তিশালী করা সম্ভব হবে। এইভাবে তিলক গণপতি এবং শিবাজী উৎসবের পুনঃপ্রবর্তন করে জাতীয়তাবাদী চেতনা বৃদ্ধি করেন। আবার সামাজিক এবং অর্থনৈতিক আন্দোলনকে সংগঠিত করেও তিলক জাতীয়তাবাদী অনুভূতিকে শক্তিশালী

করতেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, পুণে ১৮৭৭ সালের দুর্ভিক্ষের সময় তিনি ভূমি রাজস্ব প্রদানের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন।

তিলক বলতেন, কোন আঞ্চলিক ভাষা সেই অঞ্চলের একতাবোধকে বিকশিত করে। সেই একতাবোধকে শক্তিশালী করতে হবে। তবে তিলকের মতে কোন ভাষা নয়, হিন্দু ধর্মই সমস্ত ভারতে ঐক্যের শক্তি হিসাবে কাজ করেছে। হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী অবধি সমস্ত হিন্দুদের মধ্যে চিন্তা ও আচরণের ক্ষেত্রে একতা সাধনে রামায়ণ ও মহাভারত এক অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছে। অবশ্য তিলকের বিশ্বাস ছিল, ইতিহাসগত উত্তরাধিকার এবং ভাষাগত ও ধর্মীয় একতা জাতীয়তাবাদের ভিতকে শক্তিশালী করলেও যথেষ্ট বলশালী করতে পারে না। তার জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মতাদর্শকে সামনে রেখে জনগণকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে ব্যাপকভাবে সংগঠিত করা। তিলক জাতীয়তাবাদের অর্থনৈতিক দিকটিকে যথেষ্টই গুরুত্ব দিয়েছিলেন। রাণাডে, নওরোজী, রমেশ দত্ত, গোখেল প্রমুখ নরমপন্থী জাতীয়তাবাদীদের অর্থনৈতিক চিন্তাভাবনাকে তিলক সমর্থন করতেন। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে পার্থক্যও ছিল। তাঁদের মতের বিরুদ্ধে গিয়ে তিনি বলেছেন, অর্থনৈতিক সমস্যাগুলিকে তুলে ধরতে হবে জনগণের রাজনৈতিক চেতনাবৃদ্ধি এবং স্বাধীনতা আন্দোলনকে শক্তিশালী করার জন্য। এই উদ্দেশ্যে তিলক তাঁর 'কেশরী ' সংবাদপত্রে ভূমিরাজস্ব, ভূমি দলপ্রথা, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশ, যুদ্ধে সরকারী অর্থের বিপুল অপব্যয় এবং ইংরাজ রাজকর্মচারীদের বিলাসবহুল জীবনযাত্রা ইত্যাদি বিষয়ে বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন। জাতীয়তাবাদী ধ্যান ধারণা এবং আন্দোলনে তিলকের অবদান বিশ্লেষণ করে আমরা ভারতীয় ঐতিহ্য ও ধর্মের সঙ্গে পাশ্চাত্য চিন্তাধারার যে সম্মেলন লক্ষ করি তা নিঃসন্দেহে আমাদের শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

৪১.৫.৩ চরমপন্থা

নরমপন্থী এবং চরমপন্থীদের ধ্যানধারণার মূল পার্থক্যগুলি পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। এখানে তিলক অনুসৃত চরমপন্থার মূলসূত্রগুলি আলাদা করে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

(ক) ব্রিটিশ রাজের চরিত্র

নরমপন্থীদের ন্যায় ব্রিটিশরাজের মানবহিতৈষী চরিত্র অথবা ব্রিটেনের ন্যায়বিচারের প্রতি অনুরাগ সম্পর্কে তিলকের মনে বিন্দুমাত্র মোহ ছিল না। এ বিষয়ে তাঁর মনে কোন দ্বিধা ছিল না যে, অন্যান্য দেশের মত ব্রিটেনও নিজস্বার্থের তাগিদেই কাজ করে। ভারতে ব্রিটেন সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিল ভারতীয়দের উন্নতিকল্পে নয়, ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ লুণ্ঠন করার জন্য।

(খ) সাংবিধানিক বনাম প্রতিরোধের রাজনীতি (Constitutional versus Pressure Politics)

তিলক মনে করতেন, একমাত্র সাংবিধানিক সরকার (Constitutional Government) থাকলেই সাংবিধানিক পদ্ধতির (Constitutional methods) কোন অর্থ হতে পারে। কিন্তু একটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ভারতকে শাসন করছে এবং ভারতের কোন সংবিধান (Constitution) নেই, রয়েছে ফৌজদারী আইন ব্যবস্থা (Penal Code)।

(গ) উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি (Ends and Means)

উদারনীতিবিদগণ উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি উভয়েই শুদ্ধতায় (Purity of both ends and means) বিশ্বাস করতেন। তিলক পদ্ধতির শুদ্ধতার গুরুত্বকে কখনই অস্বীকার করেননি। কিন্তু এই সম্পর্কে কোন অনমনীয় নীতি গ্রহণ করার পক্ষে ছিলেন না। প্রয়োজনে লক্ষ্য অর্জনে যে কোন পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে। তিলক তাঁর মতের সমর্থনে গীতা ও মহাভারতের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন।

(ঘ) ধর্ম ও রাজনীতি

পশ্চিমী উদারনীতিবিদদের অনুসরণে নরমপন্থীরা রাজনীতি থেকে ধর্মকে তফাতে রাখার পক্ষে ছিলেন। কিন্তু তিলক এই নীতির প্রতি সমর্থন জানিয়েও প্রয়োজনে এই নীতি থেকে সরে আসতে চেয়েছিলেন। তিলকের ধারণায় জাতীয় আন্দোলনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হল স্বরাজ। জনগণকে এই আন্দোলনে সামিল করবার জন্য তিলক স্বরাজের ধর্মীয় ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন এবং দাবী করেছিলেন যে স্বরাজ আমাদের ধর্মীয় প্রয়োজন। জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সম্পর্কে জনগণের উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য তিলক ধর্মীয় উৎসবেরও সাহায্য নিয়েছিলেন।

৪১.৫.৪ নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ (Passive Registance)

নরমপন্থীদের অভিমত ছিল, বিদেশী দ্রব্য, আদালত ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বয়কট, ব্রিটিশ সরকারকে ভূমিরাজস্ব প্রদানে অস্বীকার—এইসব অসাংবিধানিক বা বেআইনী কাজ ভারতীয়রা করবে না। তিলক মনে করতেন যে এই কাজগুলিকে অসাংবিধানিক আখ্যা দেওয়া যায় না, কারণ ভারত কোন সংবিধান অনুযায়ী শাসিত হয় না। ১৮৫৮ সালের রানী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্রকে সাংবিধানিক দলিল বলা চলে না, কারণ একে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট আইন হিসাবে অনুমোদন করেনি।

বাংলা ভাগের বিরুদ্ধে ১৯০৫-০৮ সালের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলনের সময়ে তিলক ঔপনিবেশিক আইনগুলিকে ন্যায়বিরোধী ও দমনমূলক আখ্যা দিয়ে তীব্র আক্রমণ করেছিলেন। "টি. এইচ. গ্রীণের মত তিলক কু-আইনের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক কার্যকলাপের যাথার্থ্য স্বীকার করেছিলেন।" ("He, like T. H. Green, justified direct political action against bad laws.")

ঐ আন্দোলনের সময় স্বদেশী, বয়কট ও জাতীয় শিক্ষা সংক্রান্ত নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের কর্মসূচীকে তিলক ও শ্রী অরবিন্দ পরিচালনা করেছিলেন। এই প্রতিরোধ আন্দোলনকে গান্ধীর অসহযোগ ও আইন-অমান্য আন্দোলনের পূর্বসূরী মনে করা যেতে পারে।

আবেদন-নিবেদনের নরমপন্থী নীতির কার্যকারিতা সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ হয়ে তিলক প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক প্রতিরোধের ডাক দিয়েছিলেন। তাঁর মতে বিভিন্ন অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক চিন্তা ভাবনা বিভিন্ন অর্থ বহন করে। শাসক গোষ্ঠীর কাছে যা সংবিধান সম্মত ও আইনসম্মত (Constitutional and legal), তা কেবল উপনিবেশের জনগণের দৃষ্টিকোণ থেকেই নয়, উদার মানবতাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকেও অন্যায় ও অনৈতিক (Unjust and immoral) প্রতীয়মান হতে পারে। সুতরাং তিলক এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে শুধু সংবিধান বা আইনের মাপকাঠিতে নয়, ন্যায়বিচার ও নৈতিকতার মাপকাঠিতেও

সরকারী নিয়মকানুন ও আইনের মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। তিলকের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, অন্যায় ও অনৈতিক আইনকে প্রতিরোধ করা জনগণের একই সঙ্গে অধিকার ও কর্তব্য।

৪১.৬ সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন

বাল গঙ্গাধর তিলক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের একজন প্রথম সারির নেতা ছিলেন। তিনি একাধারে তাত্ত্বিক ও কর্মী (theorist and activist) ছিলেন। চরমপন্থী চিন্তাবিদ হিসাবে তিনি জাতীয় শিক্ষা, স্বরাজ, জাতীয়তাবাদ, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ ইত্যাদি বিষয়ে যুক্তিপূর্ণ তত্ত্ব রচনা করেছেন এবং সেই তত্ত্ব অনুযায়ী আন্দোলন পরিচালনা করেছেন। রাজনৈতিক তত্ত্ব রচনা ও রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালনা, উভয়ক্ষেত্রেই তিনি তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। তিলক দেশের মাটি ও মানুষের কাছাকাছি ছিলেন। দেশের ঐতিহ্য, ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর প্রগাঢ় বাস্তব জ্ঞান তাঁর আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করেছিল। ফলে তিনি আবেদন নিবেদনের রাজনীতি বাতিল করে বলিষ্ঠ আন্দোলনের পথ গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। 'লাল-বাল-পালের' শক্তিশালী চিন্তাধারা ও নেতৃত্ব মৃতপ্রায় জাতীয় আন্দোলনে প্রাণ সঞ্চার করেছিল।

এই প্রসঙ্গে বলা যায়, তিলকের চিন্তাধারায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভাবনার মিলন আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক করে। আসলে স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্যের আধুনিক বিজ্ঞান-ভিত্তিক ধ্যান-ধারণার মিলন ঘটিয়ে স্থবির ভারতীয় সমাজকে গতিশীল করার এক মহৎ কর্মযজ্ঞ শুরু করেছিলেন। সেই কর্মযজ্ঞে শ্রী অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী প্রমুখ মনীষীদের সঙ্গে তিলকও যথাযোগ্য অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিলক স্বরাজের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিয়ে হোমরুল আন্দোলনকে জনপ্রিয় করতে পেরেছিলেন।

তাঁর জাতীয়তাবাদ সম্পর্কিত ধারণাও বেদান্তদর্শনে উল্লিখিত মানুষের আধ্যাত্মিক একতা এবং পাশ্চাত্যের জাতীয়তাবাদ সম্পর্কিত চিন্তার এক অভিনব সমাহার। জাতীয়তাবাদকে শক্তিশালী করবার জন্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সাহায্য নিলেও তিলক পাশ্চাত্য চিন্তার অনুসরণে বলেছিলেন, জাতীয়তাবাদের আসল শক্তি হল রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা (Political mobilization)। তিলক বেদান্তবাদী হলেও তাঁর আধুনিক স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গীকে ধর্মের গোঁড়ামী কুয়াসাচ্ছন্ন করতে পারে নি।

প্রসঙ্গতঃ একথাও স্মরণে রাখতে হবে, তাঁর জাতীয়তাবাদ সম্পর্কিত ধারণা হিন্দু সমাজকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। মুসলমান-বৌদ্ধ-শিখ-খৃষ্টান ইত্যাদি ধর্মের মানুষ এই বৃত্তে আসেন নি। এমনকি হিন্দুধর্মের নিম্নবর্ণের মানুষ তথা দলিত সমাজও তাঁর জাতীয়তাবাদ সম্পর্কিত ভাবনার বাইরে থেকে গেছে।

অন্যদিকে, তিলককে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের মহানায়ক গান্ধীর যথার্থ পূর্বসূরী বলা যায়। গান্ধীর স্বরাজ, স্বদেশী ও বয়কট সম্পর্কে ধারণা নিঃসন্দেহে তিলকের ঐসব বিষয়ে ভাবনা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। একই ভাবে বলা যায়, গান্ধীর অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলন তিলকের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলন দ্বারা যথেষ্ট অনুপ্রাণিত হয়েছিল।

পরিশেষে, অনন্যসাধারণ দেশপ্রেমী তিলক ব্রিটিশ সরকার দ্বারা কি পরিমাণ নির্যাতিত হয়েছিলেন তা N. C. Kelkar - এর এই মন্তব্য থেকে পরিষ্কার বোঝা যাবে : "সরকার সর্বতোভাবে বিশ্বাস করত

..... নিউ পার্টির এই শীর্ষ নেতাকে জড়িয়ে না নিলে সরকারের ব্যাপক দমনমূলক কার্যকলাপ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।" [5] ("The Government never concealed their belief ..... that no campaign of repressive prosecutions could ever be complete unless it involved this towering leader of the New Party.")।

৪১.৭ সারাংশ

তিলক জাতীয় আন্দোলনের চরমপন্থী নেতা হিসাবে গত শতাব্দীর শেষভাগে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর রাজনৈতিক-সামাজিক চিন্তাভাবনাও খুব মূল্যবান। তাঁর সামাজিক চিন্তা-ভাবনার দুটি প্রধান দিক হল—সমাজসংস্কার এবং জাতীয় শিক্ষা। তিলকের রাজনৈতিক চিন্তাভাবনাকে স্বরাজ, জাতীয়তাবাদ, চরমপন্থা, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ — এই সব অংশে বিভক্ত করা যায়। পরবর্তীকালে গান্ধীর চিন্তা-ভাবনা এবং কর্মপন্থাকে তিলক অনেকখানি প্রভাবিত করেছিলেন। নেতা হিসাবে তিলকের কর্মযজ্ঞের বিশালতা এবং চিন্তাবিদ হিসাবে তাঁর অসাধারণ মননশীলতা আমাদের এক কথায় অভিভূত করে।

৪১.৮ অনুশীলনী

ক) স্বরাজ এবং জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে তিলকের চিন্তাধারা পর্যালোচনা করুন। ধর্ম বিষয়ক ধারণা তাঁর এই চিন্তাধারাকে কীভাবে প্রভাবিত করেছে ?

খ) তিলক অনুসৃত চরমপন্থার মূলসূত্রগুলি ব্যাখ্যা করুন।

গ) তিলকের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ তত্ত্ব আলোচনা করুন।

ঘ) তিলকের চিন্তাধারায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন কিভাবে ঘটেছিল তা সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

ঙ) তিলককে গান্ধীর যথার্থ পূর্বসূরী কিভাবে বলা যায় সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন।

৪১.৯ গ্রন্থপঞ্জী

1. Bal Gangadhar Tilak · "His Writings and Speeches." (Madras : Ganesh and Co., 1918).

2. Dennis Dalton : "Indian Idea of Freedom." (Gurgaon, Haryana : Academic Press, 1982)

3. N. R. Inamdar : "The Political Ideas of Lokmanya Tilak." in "Political Thought in Modern India," ed. T. Pantham and K.L. Deutsch (New Delhi : Sage, 1986).

4. I. M. Reisner and N. M. Goldberg ed. : "Tilak and the Struggle For Indian Freedom". (New Delhi : People's Publishing House, 1966).

5. N. C. Kelkar : "Landmarks in Lokamanya's Life." (Madras, 1924).

6. I. M. Reisner and N. M. Goldberg : "Tilak and the Struggle for Indian Freedom", P. 661.

7. Dennis Dalton : "Indian Idea of Freedom", p.1

8. Ibid,. p.12.

9. N. R. Inamdar : "The Political Ideas of Lokmanya Tilak," p. 119.

10. N. C. Kelkar : "Landmarks in Lokamanya's Life", pp. 132-133.

একক ৪২ □ মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

গঠন

৪২.০ উদ্দেশ্য

৪২.১ প্রস্তাবনা

৪২.২ গান্ধী : স্বাধীনতা আন্দোলনের মহানায়ক

৪২.২.১ গান্ধীর দর্শন

৪২.২.২ গান্ধী : জীবন ও কর্ম

৪২.৩ গান্ধীর মূল আদর্শগুলি (Fundamental Ideals)

৪২.৩.১ স্বনির্ভরতা (Autonomy)

৪২.৩.২ সত্য (Truth)

৪২.৩.৩ অহিংসা (Non-violence)

৪২.৩.৪ সাম্য (Equality)

৪২.৩.৫ স্বরাজ

৪২.৩.৬ সত্যাগ্রহ

৪২.৩.৭ সর্বোদয়

৪২.৪ রাষ্ট্র সম্পর্কে গান্ধীর ধারণা

৪২.৪.১ আধুনিকতা ও আধুনিকীকরণ (Modernity and modernisation) : গান্ধীর সমালোচনা

৪২.৪.২ অছি ব্যবস্থা (Trusteeship)

৪২.৫ সমাজসংস্কার বিষয়ে গান্ধীর ভাবনা

৪২.৫.১ জাতিভেদ প্রথা

৪২.৫.২ অস্পৃশ্যতা

৪২.৫.৩ নারীমুক্তি

৪২.৬ গান্ধী : একবিংশ শতাব্দীতে প্রাসঙ্গিকতা

৪২.৭ গান্ধী : সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন

৪২.৮ সারাংশ

৪২.৯ অনুশীলনী

৪২.১০ গ্রন্থপঞ্জী

৪২.০ উদ্দেশ্য

একক ২-এ বিংশ শতাব্দীতে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ ও নেতা এবং ভারতীয় জাতির জনক মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর অমূল্য কর্মময় জীবন ও চিন্তাভাবনা বিষয়ে লেখা হয়েছে।

এই একক পাঠ শেষে আপনি জানতে পারবেন :

- আজীবন সত্যান্বেষী মহাত্মা গান্ধীর অসাধারণ জীবন ও কর্মের কথা।
- ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের মহানায়ক রূপে গান্ধীর ভূমিকার কথা।
- তাঁর বিশ্বখ্যাত অহিংসার দর্শনের প্রকৃত অর্থ।
- তাঁর স্বরাজ, সত্যাগ্রহ ও সর্বোদয় বিষয়ে যুগান্তকারী চিন্তা ভাবনার কথা।
- স্বমাজসংস্কারক হিসাবে অস্পৃশ্যতা ও বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে তাঁর বলিষ্ঠ বক্তব্য।
- আধুনিকতা ও আধুনিকীকরণ সম্পর্কে তাঁর সময়োচিত সাবধানবাণী।
- রাষ্ট্র সম্পর্কে তার সুবিখ্যাত তথ্য।
- অছিব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব।

৪২.১ প্রস্তাবনা

১৯১৫ সালে ভারতের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে গান্ধীর আবির্ভাব হয়; ঐ সালে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে আসেন। একক ১-এ আমরা বলেছি, তিলককে গান্ধীর যথার্থ পূর্বসূরী বলা যায়। গান্ধীর স্বরাজ, স্বদেশী, বয়কট সম্পর্কে ধারণা এবং গান্ধীর অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনের উপর তিলকের স্পষ্ট প্রভাব চোখে পড়ে। ১৯১৫ - এর আগে গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবিদ্বেষী শ্বেতাঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের অধিকার রক্ষায় অহিংস সত্যাগ্রহের পথ বেছে নিয়েছিলেন। ভারতে তিনি তাঁর পূর্ব অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করেন এবং ধীরে ধীরে জাতীয় আন্দোলনে প্রধান নেতার ভূমিকা গ্রহণ করেন।

৪২.২ গান্ধী : স্বাধীনতা আন্দোলনের মহানায়ক

গান্ধী ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের এক শূন্যতাময় পরিস্থিতিতে ভারতে পদার্পন করেছিলেন। নরমপন্থীদের উপর জনগণের আস্থা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল; কারণ তাঁদের আবেদন-নিবেদনের নীতি ব্রিটিশ সরকারের অত্যাচার ও শোষণের তীব্রতা একটুকুও কমাতে পারেনি। ওদিকে চরমপন্থীরাও অকেজো হয়ে পড়েছিল। তাঁদের উপর সরকারের দমনের মাত্রা ক্রমেই বেড়ে চলেছিল। তাঁদের অধিকাংশ নেতাকেই ব্রিটিশ সরকার জেলে পুরেছিলেন। গান্ধী শুধু নরমপন্থী-চরমপন্থী নয়, সমস্ত ভারতীয়কেই তাঁর অহিংস

অসহযোগ আন্দোলনে (১৯২০-২২) সামিল হতে আহ্বান করলেন এবং সেই আহ্বান অনেকাংশেই সফল হয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে বলা দরকার গান্ধী নরমপন্থী-চরমপন্থী উভয়ের ধ্যানধারণাই কিছু পরিমাণে গ্রহণ করেছিলেন। কিছু বর্জনও করেছিলেন। তিনি নরমপন্থীদের মত ব্রিটিশ গণতন্ত্র ও পার্লামেন্টীয় ব্যবস্থার প্রশংসা করতেন। কিন্তু তাঁদের ধারণানুযায়ী ভারতীয় সভ্যতা অপেক্ষা ব্রিটিশ সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বকে মানতে রাজী ছিলেন না। গান্ধী নরমপন্থীদের মত বিশ্বাস করতেন, ব্রিটিশ উপনিবেশবাদ ভারতীয় অর্থনীতিকে চূড়ান্ত শোষণ করছে, কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের অনুগ্রহ পাবার আশায় আবেদন-নিবেদনের নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না। অপরদিকে, গান্ধী চরমপন্থীদের মত মনে করতেন, ভারতীয় সভ্যতা অপেক্ষা পাশ্চাত্য বা ব্রিটিশ সভ্যতা শ্রেষ্ঠ নয়, কিন্তু চরমপন্থীদের ভারতীয় ঐতিহ্য পুনরুজ্জীবনের দৃষ্টিভঙ্গীকে তিনি কখনই পুরোপুরি সমর্থন করেননি। একই সঙ্গে চরমপন্থীদের সন্ত্রাসবাদী পদ্ধতিকেও তিনি পছন্দ করেননি। আবেদন-নিবেদন নয়, সন্ত্রাসবাদ নয়, গান্ধীর ছিল অহিংস সত্যাগ্রহের পথ, যা আমরা পরে ব্যাখ্যা করবো।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে ১৯২০-২২ সালের অসহযোগ আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা প্রাপ্তি পর্যন্ত ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে গান্ধীই ছিলেন সর্বপ্রধান নেতা। তিনিই প্রথম জাতীয়তাবাদী নেতা যিনি স্বাধীনতা আন্দোলনে জনগণের ভূমিকাকে স্বীকৃতি দেন— আন্দোলনকে গণমুখী করে তোলেন।

গান্ধী আন্দোলনের এমন এক কর্মসূচী প্রনয়ণ করেন যার মধ্যে জনগণের বিভিন্ন অংশ — শ্রমিক, কৃষক, শিল্পপতি , ছাত্র, আইনজীবী ও অন্যান্য পেশাভুক্ত ব্যক্তি এবং সর্বোপরি মহিলাগণ — সবাই নিজ নিজ ভূমিকা পালন করতে পারেন। তাঁর নেতৃত্বে জনগণ দলে দলে কারাবরণ করেছিলেন, বিদেশী সরকারের পুলিশ ও সেনাবাহিনীর লাঠি ও গুলির সামনে নির্দ্বধায় বুক পেতে দিয়েছিলেন। বিশেষতঃ মহিলারা — যাঁরা শতাব্দীর পর শতাব্দী সংকীর্ণ গার্হস্থ্য জীবনে আবদ্ধ ছিলেন— হাজারে হাজারে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছিলেন। পুরুষদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে অসীম সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন। মহিলাদের এই বিপুল সংখ্যায় যোগদান শুধু স্বাধীনতা আন্দোলনকেই শক্তিশালী করে নি, ভারতের নারী মুক্তি আন্দোলনেও এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেছিল। এই প্রসঙ্গে E. Stanley Jones-এর উক্তি স্মরণীয়। তিনি লেখেন মহিলাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে সামিল করে গান্ধী "বিস্ময়কর নারীত্ব সম্পদের সদ্ব্যবহার করেছিলেন এবং জাতি পুণর্গঠনে তাঁদের এক সৃষ্টিশীল শক্তিতে পরিণত করেছিলেন।" (By drawing woman into the independence movement, Gandhi "tapped the amazing resources of womanhood and made them a constructive force in national reconstruction.")

৪২.২.১ গান্ধীর দর্শন

গান্ধীর নিজস্ব কোন দর্শন বা গান্ধীবাদ (Gandhism) বলে কিছু আছে কিনা এই নিয়ে পন্ডিত

মহলে বিতর্ক আছে। ভিখু পারেখ মন্তব্য করেছেন, গান্ধীবাদ বলে কিছু নেই, কিন্তু কোন গান্ধীবাদী গান্ধীর কিছু আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সাহসের সাথে তাঁর নিজস্ব পরীক্ষানিরীক্ষা করতে পারেন এবং প্রয়োজনে গান্ধী অনুসৃত ধারাকেও ছাড়িয়ে যেতে পারেন। গান্ধী নিজেও বলেছেন, তিনি সারাজীবন দেশের কাজে ব্যয় করেছেন, কোন গুরুগম্ভীর তত্ত্ব বা গান্ধীবাদ রচনা করেন নি।

গান্ধীবাদ বা গান্ধীর দর্শনের অস্তিত্ব আছে কি না এই বিতর্কে জড়িয়ে না পড়েও এ কথা বিনা দ্বিধায় বলা চলে, কিছু নির্দিষ্ট আদর্শ (ideals) অনুসরণ করে গান্ধী সারাজীবন এক মহৎ কর্মযোগে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর এই সব আদর্শ সম্পর্কে (স্বনির্ভরতা, সত্য, অহিংসা, স্বাধীনতা, সাম্য) তিনি তাঁর ধারণাও নির্দিষ্টভাবে পরিস্ফূট করেছেন। গান্ধীর কৃতিত্ব এইখানেই যে, ব্যক্তি জীবনে বা সমাজজীবনে প্রচলিত কিছু আদর্শ বা মূল্যবোধকে (সত্য, অহিংসা ইত্যাদি) তিনি সাফল্যের সঙ্গে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে প্রয়োগ করতে পেরেছেন।

৪২.২.২ গান্ধী : জীবন ও কর্ম

১৮৬৯ সালের ২রা অক্টোবর গান্ধী গুজরাটের পোরবন্দর শহরে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতামাতা উভয়েরই সততা, নীতিজ্ঞান বোধ ও দয়াধর্ম তাঁকে অল্প বয়স থেকেই প্রভাবিত করেছিল। তবে গান্ধী তাঁর আত্মচরিতে স্বীকার করেছেন, মাতার গভীর ধর্মবোধ ও আত্মত্যাগের প্রবণতা তাঁর জীবনে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করেছিল। গান্ধী পরিবার নিষ্ঠাবান হিন্দু (বৈষ্ণব) ধর্মাবলম্বী হলেও তাঁর পিতার জৈন, মুসলিম ও পার্শী বন্ধুদের প্রতি উদারতা গান্ধীকে সব ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে শিখিয়েছিল। স্ত্রী কস্তুরবায় প্রবল, অথচ শান্ত ব্যক্তিত্ব গান্ধীকে পরবর্তী জীবনে অহিংস প্রতিরোধ আন্দোলন সংগঠনে উদ্বুদ্ধ করে।

১৮৮৮ সালের সেপ্টেম্বরে উনিশ বছর বয়সে গান্ধী আইনশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য লন্ডনে যান। যাত্রার পূর্বে তাঁর মা তাঁকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিলেন, তিনি চরিত্ররক্ষার্থে মদ, মাংস ও নারী সম্পর্কে সংযত থাকবেন। লন্ডনে গান্ধী পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে চলনে-বলনে পোষাক-পরিচ্ছদে নিজেকে 'ইংরাজ ভদ্রলোক' ("English Gentleiman") হিসাবে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতে লাগলেন। তবে কিছুদিনের মধ্যে গান্ধী বিদেশী বন্ধুদের সান্নিধ্যে এসে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়ের সভ্যতা-সংস্কৃতি, দর্শন ও ইতিহাস সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হন।

১৮৯৩ সালে গান্ধী লন্ডনের আইন ডিগ্রী অর্জন করে দক্ষিণ-আফ্রিকায় যান আইনজীবী (ব্যারিস্টার) পেশা অনুসরণ করবার জন্য। এই দক্ষিণ আফ্রিকাতেই তাঁর চিন্তা ও কর্মধারায় এক বিরাট পরিবর্তন আসে।

দক্ষিণআফ্রিকার প্রথম কয়েক বছর গান্ধী আগের মতই ব্রিটিশ সভ্যতার অনুরাগী হিসাবেই জীবন কাটিয়েছিলেন। কিন্তু ১৯০৬ সালে জুলু বিদ্রোহের সময় তিনি ব্রিটিশ সেনাদের শুশ্রুষাকারী হিসাবে কাজ

করতে গিয়ে দেখলেন, জুলুদের প্রতি ব্রিটিশ সেনারা কি অমানুষিক অত্যাচার করেছে। জুলু বিদ্রোহ দমনের নামে ব্রিটিশ সেনাবাহিনী অগণিত অসামরিক জুলুদের উপর নির্মম অত্যাচার চালিয়েছে। ব্রিটিশ "সভ্যতা-সংস্কৃতির" প্রকৃত স্বরূপ অবশেষে গান্ধীর চোখে ধরা পড়ল। এর কিছুদিন পর ব্রিটিশ সরকার এক "কালা কানুন" জারি করে দক্ষিণ-আফ্রিকার সব ভারতীয়কে আদেশ করে তারা যেন আঙ্গুলের ছাপ দিয়ে তাদের নাম নথিভুক্ত করে। প্রতিবাদ হিসাবে গান্ধী জোহানেস্‌বার্গে তিনহাজার ভারতীয়কে নিয়ে এক অহিংস আইন অমান্য আন্দোলন সংগঠিত করেন। বলা যায়, এটাই ছিল গান্ধীর জীবনে প্রথম সত্যাগ্রহ আন্দোলন। তখন থেকে গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকায় নানা অবিচারের প্রতিবাদে একের পর এক অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলন করতে থাকেন। ১৯০৯ সালে প্রকাশিত "হিন্দু স্বরাজ" পুস্তকে গান্ধী তাঁর সত্যাগ্রহ ও স্বরাজ সম্পর্কে ধারণা ব্যাখ্যা করেন। এই সব চিন্তাভাবনার উপর থুরো (Yhoreau) ও টলস্টয়ের (Tolstoy) প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। নিজের ভাবনার সংকট কাটিয়ে ওঠার জন্যে তিনি টলস্তয়ের সঙ্গে পত্রালাপও করেন।

এইভাবে দক্ষিণ আফ্রিকার অভিজ্ঞতা এবং সেই প্রসঙ্গে নানা রাজনৈতিক দার্শনিক জিজ্ঞাসার উত্তর সন্ধানের প্রয়াস তাঁর চিন্তাভাবনা ও কর্মপদ্ধতিকে এক পরিণত রূপ দেয়। এই অবস্থায় ১৯১৫ সালে তিনি ভারতে ফিরে আসেন। এই প্রসংগে বি.আর.নন্দা সঠিকভাবেই মন্তব্য করেছেন, 'দক্ষিণ আফ্রিকা তাঁর জন্যে যা করেছিল তার তুলনায় তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার জন্যে যা করেছিলেন তার গুরুত্ব অনেক কম।" ("What Gandhi did to South Africa was less important than what South Africa did to him.")

আগেই বলা হয়েছে, গান্ধী যখন ভারতে পৌঁছলেন তখন কংগ্রেসের নরমপন্থী ও চরমপন্থী এই দুটি গোষ্ঠীর পারস্পরিক কলহের ফলে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছিল। এ কথা নির্দ্বিধায় বলা চলে, গান্ধী স্বাধীনতা আন্দোলনে শুধু নতুন প্রাণ-সঞ্চারই করলেন না, তাকে এক অহিংস গণ আন্দোলনে পরিণত করলেন।

১৯১৯ সালে অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে নিরীহ লোকদের উপর নৃশংসভাবে যথেচ্ছ গুলি চালিয়ে চারশ ব্যক্তিকে হত্যা ও পনেরোশ ব্যক্তিকে ঘায়েল করা হয়। প্রতিক্রিয়া স্বরূপ সমস্ত ভারতব্যাপী ধিক্কার ও বিক্ষোভের প্রেক্ষাপটে গান্ধী এক বিশাল অসহযোগ আন্দোলন (১৯২০-২২) শুরু করেন। আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষ এই আন্দোলনে উত্তাল হয়ে ওঠে। কিন্তু বিহারের চৌরিচৌরা নামক স্থানে আন্দোলন সহিংস রূপ নিয়ে নেয়। পুলিশের পীড়ন সহ্য করতে না পেরে আন্দোলনকারীরা থানা আক্রমণ করে জনগণ দুজন পুলিশ কর্মচারীকে হত্যা করে। গান্ধী আন্দোলন প্রত্যাহার করেন। অতঃপর স্বাধীনতা আন্দোলনের পুরোধা নেতা গান্ধীর নেতৃত্বে বেশ কিছু অহিংস আন্দোলন সংগঠিত হয়। তবে প্রায় দশ বছর অন্তর অন্তর আরো দুটি ঐতিহাসিক সত্যাগ্রহ আন্দোলন ঘটে। আইন অমান্য আন্দোলন (Civil Disobedience Movement, 1930-31) এবং ভারত ছাড় আন্দোলন (Quit India Movement, 1942-44) । সমস্ত আন্দোলনেরই সাধারণ উদ্দেশ্য ছিল স্বরাজ অর্জন।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট দ্বি-খন্ডিত ভারত স্বাধীনতা অর্জন করলেও ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা প্রায় গৃহযুদ্ধের রূপ নেয়। সত্তরোর্ধ গান্ধী তখন উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিম ভারতে উন্মত্ত সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ রোধ করবার জন্য বিভিন্ন স্থানে পদযাত্রা ও অনশন শুরু করেন। ১৯৪৬ সালের নভেম্বর ও ডিসেম্বরে তিনি সমগ্র বাংলায় ১১৬ মাইল ব্যাপী ৪৭ টি গ্রাম পরিক্রমা করেন। অতঃপর তিনি বিহার, দিল্লী, পাঞ্জাব ইত্যাদি প্রদেশে শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা সভা ও অনশনের আয়োজন করেন। ১৯৪৭ সালেও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বন্ধের জন্যে তিনি কলকাতায় অনশন ও নোয়াখালিতে পদযাত্রা করেন। ১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারী, গান্ধী দিল্লীর বিড়লা ভবনে অনুষ্ঠিত এক প্রার্থনা সভায় যাওয়ার পথে নাথুরাম গডসে নামে এক উগ্র হিন্দুত্ববাদী মারাঠী আততায়ীর গুলিতে প্রাণ হারান। এইভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনের মহানায়ক সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার মহান উদ্দেশ্যে নিজের জীবন বলি দেন।

ঐ দিন দিল্লী থেকে বেতার ভাষণে জওহরলাল নেহেরু দেশবাসীকে বলেন, আমাদের 'জীবনের আলো নিভে গেল '(Light is out of life)' । আমাদের জাতির জনক আর আমাদের মধ্যে নেই। নেহরু আরও বলেন কিন্তু এ আলো নেভে না। এ আলো সাধারণ আলো নয়। এ আলো আরও বহুদিন জ্বলবে।

৪২.৩ গান্ধীর মূল আদর্শগুলি

গান্ধীর মূল আদর্শগুলি গান্ধীর বক্তব্য ও কার্যকলাপ বোঝার পক্ষে খুব জরুরী। এগুলি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা যাক।

৪২.৩.১ স্বনির্ভরতা

গান্ধী বিশ্বাস করতেন যে, প্রত্যেকটি মানুষের স্বাতন্ত্র্য থাকবে। এর অর্থ, নৈতিক জীব (moral beings) হিসাবে আমাদের অধিকার আছে যে অপরে আমাদের সত্ত্বাকে শ্রদ্ধা করবে। সঙ্গে সঙ্গে অপরের সত্ত্বাকে শ্রদ্ধা করার দায়িত্বও প্রত্যেকের ওপর বর্তায়। আমরা যদি এই দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করি তাহলে আমরা ব্যক্তিকে লক্ষ্য (ends) হিসাবে দেখছি, লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যম (means) হিসাবে নয়। বলপ্রয়োগ দ্বারা কোন ব্যক্তিকে তার আশা-আকাঙ্খা পরিত্যাগ করতে বাধ্য করে তাকে আমার আশা-আকাঙ্খা অনুযায়ী চালাতে পারব না। প্রত্যেক ব্যক্তিরই ব্যক্তি হিসাবে স্বনির্ভরতা (Autonomy) রয়েছে এবং সবাইকে সে কথা মানতে হবে। গান্ধীর স্বনির্ভরতার আদর্শের সঙ্গে তাঁর সত্য ও অহিংসার আদর্শেরও ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। এবারে তা ব্যাখ্যা করা হচ্ছে।

৪২.৩.২ সত্য

গান্ধী প্রতিটি ব্যক্তির স্বনির্ভরতায় বিশ্বাস করতেন। তিনি বলতেন চরম সত্যের (absolute truth) অস্তিত্ব আছে কিন্তু কোন ব্যক্তি আলাদাভাবে তা জানতে পারে না। ব্যক্তি নিজে কোন আপেক্ষিক সত্য (relative truth) জানতে পারে। একজন ব্যক্তির জানা আপেক্ষিক সত্য তার দৃষ্টিকোণ থেকে সঠিক। আবার অন্য ব্যক্তির জানা আপেক্ষিক সত্য তার দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সঠিক। অতএব সবার জানা আপেক্ষিক

সত্য তাদের নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সঠিক। অতএব এই সিদ্ধান্তে আসা যায়, কেউই যেহেতু চরম সত্য (absolute truth) জানে না, অতএব কেউই তার জানা আপেক্ষিক সত্য মানাতে অপরকে বাধ্য করতে পারে না। হিংসা প্রয়োগে তো একেবারেই নয়। এইখানেই গান্ধীর স্বনির্ভরতা ও অহিংসার আদর্শের ভিত্তিভূমি খুঁজে পাওয়া যাবে।

আমরা কেউই চরম সত্য জানি না, প্রত্যেকেই আপেক্ষিক সত্য জানি। অতএব অপরের প্রতি বলপ্রয়োগ না করে তাঁর স্বনির্ভরতাকে শ্রদ্ধা করতে হবে এবং তাঁর প্রতি অহিংস আচরণ করতে হবে। প্রসঙ্গত বলা যায়, চরম সত্য (absolute truth) কোন ব্যক্তি, জাতি, দেশ ও কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, তা এসবকে ছাপিয়ে যায় (transcends)। কোন নির্দিষ্টকালে বিভিন্ন ব্যক্তি চেষ্টা দ্বারা চরম সত্যের কিছু আভাস পেতে পারে মাত্র।

৪২.৩.৩ অহিংসা

আমরা দেখিয়েছি স্বনির্ভরতা ও অহিংসার আদর্শ কিভাবে গান্ধীর সত্য সম্পর্কিত আদর্শকে ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে। গান্ধী বলতেন, হিংসা শুধু হিংসার পাত্রকেই অমানুষ করে তোলে। তিনি আরও বলেন, শুধু ব্যক্তিই হিংস্র আচরণ করে না, সামাজিক প্রতিষ্ঠানও হিংসার জন্ম দেয়। এই প্রসঙ্গে গান্ধী দারিদ্র্য, বেকারত্ব ও বৈষম্যের উদাহরণ দিয়েছেন।

৪২.৩.৪ সাম্য

গান্ধী সাম্য বলতে সবার জন্য কঠোর আর্থিক সাম্য বোঝাতেন না। তাঁর মতে সাম্যের অর্থ হ'ল, প্রত্যেকেই তাঁর প্রয়োজনের অনুপাতে স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করবে। জনগণের মধ্যে তীব্র আর্থিক বৈষম্য থাকবে না। কিন্তু এক্ষেত্রে সম্পত্তির রাষ্ট্রীয় মালিকানা তিনি পছন্দ করেন নি, কারণ রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ ব্যক্তির স্বনির্ভরতা বা স্বাধীনতাকে নষ্ট করে। গান্ধীর ধারণায় প্রত্যেকে নিজ হাতে কাজ করলে সাম্যের লক্ষে পৌঁছানো সম্ভব। এই কারণে গান্ধীর আদর্শ গ্রামে কেবল তাদেরই ভোটাধিকার দেওয়া হয়েছে যারা নিজ হাতে চরকা কাটে। গান্ধীর মতে সাম্যের পরিবেশ না থাকলে স্বনির্ভরতা ও অহিংসার আদর্শ রূপায়ণ সম্ভব নয়।

অনুশীলনী-১

(ক) গান্ধীকে স্বাধীনতা আন্দোলনের মহানায়ক বলা হয় কেন?

(খ) গান্ধীর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুণ।

(গ) গান্ধীর 'স্বনির্ভরতা' সংক্রান্ত ধারণা সংক্ষেপে বলুন।

(ঘ) গান্ধীর 'সত্য' সংক্রান্ত ধারণা সংক্ষেপে বলুন।

(ঙ) গান্ধীর 'অহিংসা' সংক্রান্ত ধারণা সংক্ষেপে বলুন।

(চ) গান্ধীর 'সাম্য' সংক্রান্ত ধারণা সংক্ষেপে বলুন।

৪২.৩.৫ স্বরাজ

গান্ধীর মতে স্বরাজের অর্থ হল আত্ম-শাসন (Self-rule) অর্থাৎ নিজের উপর নিজের নিয়ন্ত্রণ। এই আত্ম-শাসন বা আত্মনিয়ন্ত্রণের অর্থ শুধু ব্রিটিশ শাসন মুক্ত হওয়া নয় — সর্বার্থে ব্যক্তিকে পরশাসনমুক্ত হতে হবে। গান্ধী বলেছেন, তাঁর স্বরাজ সংক্রান্ত ধারণাকে একটা বর্গক্ষেত্র বলা চলে। একদিকে রয়েছে রাজনৈতিক স্বাধীনতা, অপর দিকে রয়েছে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। বাকি একদিকে রয়েছে নৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতা, এবং অন্যদিকে ধর্মীয় স্বাধীনতা। কিন্তু গান্ধীর ধারণানুসারে এই ধর্ম সাধারণ অর্থে ধর্ম নয়; যে সত্য সর্বব্যাপী এবং অবিনশ্বর সেই সত্যকেই এখানে ধর্ম বলা হয়েছে। সেই সত্য সন্ধানের স্বাধীনতাও সকলের থাকবে।

গান্ধী অন্যত্র বলেছেন, কেবল ব্রিটিশ শাসনমুক্ত হলেই স্বরাজ আসবে না, প্রকৃত স্বরাজ আনতে হলে রাজনৈতিক স্বাধীনতার সাথে ব্যাপক সমাজ-সংস্কারও করা দরকার। এই সমাজ-সংস্কার প্রধানতঃ তিন রকম : হিন্দু-মুসলমান একতা, অস্পৃশ্যতা বিলোপ এবং গ্রামের সর্বাঙ্গীন উন্নতি। কিন্তু গান্ধী এ কথাও বলেছেন, এই সমাজ সংস্কারের সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক রয়েছে মানুষের মনে । মানুষের মনেই কুসংস্কার, ধর্মীয় উন্মাদনা এবং বিচারবুদ্ধিহীন আবেগের বাস। প্রত্যেক ব্যক্তিকে এই মানসিক বাধা কাটিয়ে উঠে আত্মনিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এইভাবে সমাজ সংস্কার হলে প্রকৃত-স্বরাজ অর্জন করা সম্ভব হবে।

গান্ধীর মতে স্বরাজ অর্জনের জন্য "অংশগ্রহণকারী গণতন্ত্র" ("Participatory Democracy") থাকা প্রয়োজন। তিনি পশ্চিমী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় স্বরাজ ভোগ করা সম্ভব নয় মনে করতেন, কারণ তাঁর মতে, "ক্ষমতায় সবাই অংশগ্রহণ না করলে গণতন্ত্র একটা অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।" পশ্চিমী গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ শাসন ব্যক্তির স্বাধীনতাকে ধ্বংস করে। গ্রামের অসংখ্য লোককে "সর্বোচ্চ স্থানে অবস্থিত কুড়ি জন লোক" শাসন করে। গান্ধী পরিকল্পিত "অংশগ্রহণকারী গণতন্ত্রে" গ্রামীন সরকারের (Village Government) খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবে ব্যক্তি এবং তাঁর ধারণা অনুযায়ী এইভাবেই সরকারী ক্ষমতা সমাজের সর্বস্তরে ছাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হবে।

৪২.৩.৬ সত্যাগ্রহ

গান্ধীর স্বরাজ হল লক্ষ্য (end), সেই লক্ষ্যে পৌঁছবার উপায় বা পদ্ধতি (means) হল সত্যাগ্রহ। সত্যাগ্রহী কোন অন্যায়ের বিরুদ্ধে অহিংস এবং নৈতিক প্রতিবাদ জানাবে, প্রতিপক্ষকে কোন আঘাত করে নয়, নিজ ত্যাগ ও দুঃখবরণ করে। সে আশা করবে নৈতিক শক্তির মুখোমুখি হয়ে প্রতিপক্ষের হৃদয়ের পরিবর্তন হবে এবং সে অন্যায়ের পথ পরিত্যাগ করবে। সত্যাগ্রহের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে— সত্যের প্রতি আগ্রহ, অহিংসা, প্রতিপক্ষ সম্পর্কে শ্রদ্ধা এবং প্রতিবাদকারীর নৈতিক আচরনবিধি।

গান্ধী মনে করতেন, সত্যাগ্রহ এবং নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। নিষ্ক্রিয়

প্রতিরোধ হল দুর্বলের অস্ত্র। কার্যসিদ্ধির জন্য প্রতিরোধকারী প্রয়োজনে হিংসার আশ্রয় নেয়। কিন্তু সত্যাগ্রহ শক্তিমানের অস্ত্র এবং সত্যাগ্রহে কোনভাবেই বলপ্রয়োগ করা হয় না।

গান্ধীর ধারণায় সত্যাগ্রহী পারিবারিক নিয়মকে বৃহত্তর সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে। সত্যাগ্রহী "পরাজয় কি জানে না, কারণ সে অক্লান্তভাবে সত্যের জন্য লড়াই করে।" মৃত্যুকে সত্যাগ্রহী মনে করে "মুক্তি" এবং কারাগারকে "স্বাধীনতার সিংহদ্বার"। গান্ধী সত্যাগ্রহকে "আত্মার শক্তি" ("Soul force") বলে অভিহিত করেছেন; সত্যাগ্রহীর মৃত্যু যদি সংগ্রামের শেষ না হয়ে "মুক্তি" হয়, তবে সত্যাগ্রহীর আত্মাকেও অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। J. Smuts যথার্থই বলেছেন, যেখানে যুক্তি দিয়ে বোঝানো ব্যর্থ হয়, সেখানে প্রতিপক্ষের সহানুভূতি আদায়ের জন্য আত্মত্যাগের নীতিগ্রহণ নিঃসন্দেহে "রাজনৈতিক পদ্ধতির ক্ষেত্রে গান্ধীর সুস্পষ্ট অবদান।"

৪২.৩.৭ সর্বোদয়

"সর্বোদয়" শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল সবার "উদয়" অর্থাৎ সবার মঙ্গল। গান্ধী সর্বোদয় বলতে বুঝেছেন, ব্যক্তির বৈষয়িক, আত্মিক সব দিক থেকে মঙ্গল অর্থাৎ ব্যক্তির সামগ্রিক জীবনের সুষম বিকাশ। সমস্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রেই এই জাতীয় মঙ্গলের কথা ভাবা হয়েছে।

আসলে সর্বোদয়কে এমন একটি সমাজ বলা চলে যেখানে এক বিশেষ ধরণের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা রয়েছে। এই সমাজ যেসব আদর্শ দ্বারা পরিচালিত হয় সেগুলি হল — অহিংসা, সম্প্রীতি ও সাম্য, সকলের মঙ্গল, নতুন মূল্যবোধ, আত্মসংযম, কায়িক পরিশ্রম, বৃহৎ সরকারের পরিবর্তে গ্রামীন সরকার বৃহৎ শিল্পের পরিবর্তে গ্রামীন ও ক্ষুদ্র শিল্প। সর্বোদয়ের মূল কথা হ'ল — "সবার উপর মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।" এই মানুষ বর্তমান যুগে অসাম্য, অবিচার ও অত্যাচারের কারণে তার স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছে। গান্ধীর উদ্দেশ্য ছিল, স্বমহিমায় মানুষকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।

গান্ধী মনে করতেন বৃটিশ শাসন ভারতের শক্তিশালী গ্রাম পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে ধংস করেছে। তিনি ওই পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে তাকে গ্রামীণ সরকারের ক্ষমতা ও দায়িত্ব দিতে চান। দৈনন্দিন জীবনের মূল প্রয়োজনগুলি অর্থাৎ আহার, বাসস্থান, বস্ত্র, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের দায়িত্ব এই গ্রামীণ সরকারের উপর থাকবে। গ্রামীণ সরকারকে নির্বাচিত করবে গ্রামীণ জনগণ। পূর্বে আলোচিত গান্ধীর "স্বরাজ" সংক্রান্ত ধারণার মধ্যে আমরা এই গ্রামীণ সরকারের কথা পড়েছি।

গান্ধী অর্থনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণের কথাও বলেছেন অর্থাৎ গ্রামীণ ও ক্ষুদ্রশিল্পের বিকাশ করতে চেয়েছেন। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রামস্তর থেকে রচনা করতে হবে। তাঁর মতে মানুষ আত্মসংযম দেখিয়ে সহজ সরল জীবন যাপন করবে। বৈষয়িক বিষয়ে মাত্রাতিরিক্ত লোভ শুধু নৈতিক দিক থেকেই ক্ষতিকারক নয়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রেও সংকট ঘনীভূত করে।

৪২.৪ রাষ্ট্র সম্পর্কে গান্ধীর ধারণা

গান্ধী সারাজীবন অহিংসার পূজারী ছিলেন। তিনি মনে করতেন রাষ্ট্র হ'ল "সংগঠিত হিংসা" অর্থাৎ রাষ্ট্র নামক সংগঠনের প্রকৃতির ভিত্তিই হল পীড়ন ও হিংসা। রাষ্ট্র বলপূর্ব্বক মানুষের বশ্যতা আদায় করে। এই কারণে গান্ধী রাষ্ট্র-বিরোধী মনোভাব পোষণ করতেন। গান্ধীর ধারণায়, যদিও রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপে কোথাও কোথাও শোষণ ও বঞ্চনার অবসান ঘটা সম্ভব, তবুও আসলে রাষ্ট্র মানুষের চরম ক্ষতিসাধন করে। কারণ রাষ্ট্রের বলপ্রয়োগ ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ও নৈতিক চরিত্রকে ধ্বংস করে দেয়। গান্ধী বলতেন, রাষ্ট্র যেহেতু "হৃদয়হীন যন্ত্র" ("Soulless machine"), অতএব কোনভাবেই তার হিংস্র স্বভাবের পরিবর্তন করা যায় না।

গান্ধী বাস্তববাদী চিন্তাবিদ হিসাবে বুঝেছিলেন, রাষ্ট্রকে সম্পূর্ণভাবে বিলোপ করা অসম্ভব। সেজন্য তিনি "অহিংস রাষ্ট্রের" ("Non-violent State") কথা বলেছেন। সে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকবে, কিন্তু সে ন্যূনতম বলপ্রয়োগ করবে। গান্ধীর স্বরাজ ও সর্বোদয়ের আদর্শ সম্পর্কে জানতে গিয়ে যে গ্রামীণ সরকারের কথা জানা গেছে সেই সরকার, গান্ধীর মতে, এইরকম ন্যূনতম বল প্রয়োগই করবে। গ্রামীণ সরকারের কাজকর্ম ও আচরণের ভিত্তি হবে হিংস্রতা নয়, নীতিবোধ ও দায়িত্বশীলতা। এই প্রসঙ্গে গান্ধীর বিখ্যাত "রামরাজ্য" ধারণার কথা মনে আসে। গান্ধী "রামরাজ্য" বলতে বুঝিয়েছেন পূর্ণাঙ্গ গণতন্ত্র, যেখানে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই সহিষ্ণুতা অনুশীলন করবে। সমাজের সকল স্তরে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে।

গান্ধী সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে পরিস্কার পার্থক্য করে সমাজকে রাষ্ট্র অপেক্ষা অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। সমাজ রাষ্ট্রের ন্যায় বলপ্রয়োগ করে না। সমাজের পরিমন্ডলে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের স্ফূরণ ও নৈতিক উন্নতি সহজ ও স্বাভাবিকভাবে হতে পারে।

৪২.৪.১ আধুনিকতা ও আধুনিকীকরণ (Modernity and Modernisation) : গান্ধীর সমালোচনা

গান্ধী আধুনিকতা ও আধুনিকীকরণের সুবিধাগুলি কখনও অস্বীকার করেননি, কিন্তু তিনি মনে করতেন এই সব সুবিধা পাবার জন্য মানুষকে খুব বেশী মূল্য দিতে হচ্ছে। আধুনিক বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যার সুবাদে মানুষের গড় আয়ু বেড়ে গেছে, উৎপাদন বেড়ে গেছে এবং দুর্ভিক্ষ ও খরাকে অনেকটা প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়েছে। অতিরিক্ত দৈহিক পরিশ্রমের হাত থেকে শ্রমজীবীকে বাঁচানো সম্ভব হয়েছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গণহত্যার জন্য মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রও তৈরী হয়েছে। গ্রাম থেকে শহরে আসা শ্রমজীবী মানুষদের মধ্যে কর্মহীনতা দেখাদিয়েছে। শ্রমিকদের কাজ বৈচিত্রহীন হয়ে পড়েছে। এবং সাধারণভাবে সমস্ত মানুষের মধ্যে অসহায়তা ও নিঃসঙ্গতাবোধ দ্রুত ছড়িয়ে যাচ্ছে।

আধুনিকতা ও আধুনিকীকরণ প্রসঙ্গে গান্ধীর সমালোচনা পড়ে অনেকে গান্ধীকে প্রগতিবিরোধী আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু গান্ধীর সমালোচনার একটা বিশেষ মূল্যও রয়েছে। গান্ধীর সমালোচনাকে গ্রহণ না করেও আমরা যদি আধুনিকতা ও আধুনিকীকরণ সম্পর্কে তাঁর সাবধান বাণীকে খেয়াল রাখি তাবে আমাদের অগ্রগতির পথ সুগমই হবে।

অনুশীলনী-২

(ক) গান্ধী স্বরাজ বলতে কি বুঝতেন?

(খ) গান্ধী-প্রচারিত সত্যাগ্রহের অর্থ কি?

(গ) গান্ধীর সর্বোদয় ধারণার উপর একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন।

(ঘ) গান্ধী কেন রাষ্ট্রবিরোধী ছিলেন? সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

(ঙ) গান্ধী কি আধুনিকতা ও আধুনিকীকরণের বিপক্ষে ছিলেন?

৪২.৪ অছি ব্যবস্থা (Trusteeship)

গান্ধীর অছি ব্যবস্থা সম্পর্কে তত্ত্বের মূল কথা হল, ত্যাগের মাধ্যমে ভোগ। গান্ধী অর্থনৈতিক-সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার সংকল্পে অছি ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে চেয়েছেন। পুঁজিপতিদের কাছে আবেদন করে তাদের হৃদয়ের পরিবর্তন করতে হবে এবং তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তির একটা অংশ অছি ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করা হবে। গান্ধী আইনের মাধ্যমে প্রগতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি মনে করতেন, একমাত্র মানুষের মনের পরিবর্তন হলেই আইন কার্যকর হতে পারে। কিন্তু অছি ব্যবস্থাকে রাষ্ট্রের আইন নিয়ন্ত্রণ করবে, গান্ধী এই অভিমত পোষণ করেছেন। গান্ধী সমাজতন্ত্রীদের মত ব্যক্তিগত সম্পত্তির রাষ্ট্রীয়করণের মাধ্যমে সামাজিক অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে চাননি। কারণ তিনি মনে করতেন এর ফলে রাষ্ট্রের ক্ষমতা অত্যধিক বৃদ্ধি পাবে এবং রাষ্ট্র ক্রমে স্বৈরাচারী হয়ে ব্যক্তির সর্বপ্রকার অধিকার খর্ব করবে।

অছি ব্যবস্থা প্রত্যেকের জন্য সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ আয় বেঁধে দেবে। কোন্ পণ্য কি পরিমাণে উৎপাদিত হবে তা নির্ধারিত হবে সামাজিক প্রয়োজনের দ্বারা, মুনাফায় পরিমাণের দ্বারা নয়। গান্ধীর অছি ব্যবস্থা সম্পর্কিত তত্ত্বের উদ্দেশ্য যে মহৎ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু সমালোচকরা এই তত্ত্বের বাস্তবমূল্য সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। কখনও কোন দয়ালু পুঁজিপতি তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তির কিছু অংশ জনসেবায় দান করতে পারেন। কিন্তু শ্রেণী হিসাবে পুঁজিপতিরা কোন দেশে তাঁদের ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকাংশ দান করবেন এমন সম্ভাবনা অবিশ্বাস্য বলে মনে হতে পারে।

৪২.৫ সমাজসংস্কার বিষয়ে গান্ধীর ভাবনা

এই এককে গান্ধীর স্বরাজ বিষয়ে ধারণাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলা হয়েছে, গান্ধীর মতে দেশ ব্রিটিশ শাসনমুক্ত হলেই স্বরাজ আসবে না। প্রকৃত স্বরাজ আনতে হলে রাজনৈতিক স্বাধীনতার সাথে ব্যাপক সমাজসংস্কারও করা দরকার। সামাজিক সাম্য ও স্বাধীনতা না থাকলে রাজনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। গান্ধীর সমাজসংস্কার বিষয়ে তিনটি ভাবনাকে এখন আলোচনা করা যেতে পারে, জাতিভেদ প্রথা, অস্পৃশ্যতা ও নারীমুক্তি।

৪২.৫.১ জাতিভেদ প্রথা

গান্ধী বর্তমান হিন্দুসমাজে প্রচলিত জাতিভেদ প্রথার তীব্র বিরোধী ছিলেন। তিনি প্রাচীন হিন্দুদের বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার বিরোধী ছিলেন না। কর্মের ভিত্তিতে সেখানে বর্ণব্যবস্থা রচিত হয়েছিল। বিভিন্ন বর্ণের ব্যক্তিরা বিভিন্ন কাজ করত। যদিও ব্যক্তির বর্ণ নির্ধারিত হত জন্ম দ্বারা, তবুও বর্ণভূক্ত থাকার জন্য তাকে প্রয়োজনীয় কর্ম সম্পাদন করতে হত। ব্রাহ্মণের সন্তান ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মালেও উপযুক্ত কর্মের অভাবে তার ব্রাহ্মণত্ব নষ্ট হয়ে যেত। একইভাবে, কর্মগুণে শুদ্রের সন্তান ব্রাহ্মণত্ব অর্জন করতে পারত। কিন্তু বর্তমান জাতিভেদ প্রথা, গান্ধীর মতে, বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিরোধী। জাতিভেদ প্রথা হিন্দুধর্ম বিরোধী। এই প্রথা সমাজে অত্যাচার ও অবিচারকে সমর্থন করে। গান্ধী যথাশীঘ্র সম্ভব এই জাতিভেদ প্রথা ধ্বংস করতে দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন।

৪২.৫.২ অস্পৃশ্যতা

গান্ধী হিন্দুদের একটি অংশকে অস্পৃশ্য মনে করার বিরুদ্ধে সারাজীবনই জেহাদ ঘোষণা করেছেন। ১৯২৫ সালে একটি ভাষণে তিনি আবেগমথিত কণ্ঠে বলেছিলেন, অস্পৃশ্যতা যদি হিন্দুধর্ম হয়, তবে ঈশ্বর তোমার প্রতি আমার কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা, যত শীঘ্র একে ধ্বংস করবে ততই সবার মঙ্গল হবে। গান্ধী তথাকথিত অস্পৃশ্যদের নামকরণ করেছিলেন "হরিজন"; বলেছিলেন ওরা "হরিজন" অর্থাৎ ভগবানের লোক আমরা "দুর্জন" অর্থাৎ দুষ্ট লোক।

সন্দেহ নেই, গান্ধীর অস্পৃশ্যতা বিরোধী আন্দোলন মূলতঃ মানবিকতার আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও সত্য যে গান্ধী মনে করতেন, হিন্দু জনসংখ্যার এক পঞ্চমাংশকে দূরে সরিয়ে রাখলে জাতীয় স্বাধীনতা ও সমাজ পুনর্গঠনের লক্ষ্যে কখনই পৌঁছানো যাবে না। তিনি তাঁর অস্পৃশ্যতা বিরোধী আন্দোলনকে হিন্দুদের সমাজ সংস্কারের মধ্যে নিবদ্ধ রাখতে চান নি। তিনি মন্তব্য করেছিলেন, অস্পৃশ্যতার দুষ্টক্ষত চারদিকে এমনভাবে ছড়িয়ে গেছে যে কেবল হিন্দুদের মধ্যে একতা আনাই যথেষ্ট নয়। হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রীষ্টান, পার্শী, ইহুদি সবাইকেই শুভেচ্ছা ও সম্প্রীতির বন্ধনে বাঁধতে হবে। কারণ আমরা সবাই শুধু এক ভারতীয় পরিবারেরই সন্তান নই, আমরা এক বিশ্ব মানব পরিবারেরও সন্তান।

৪২.৫.৩ নারীমুক্তি

৪২.২ এককে দেখা গেছে, ভারতীয় নারীরা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে হাজারে হাজারে গান্ধী পরিচালিত বিভিন্ন স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন। এইভাবে জাতির স্বাধীনতা আন্দোলন শুধু শক্তিশালী হয়েছিল তাই নয়, ভারতীয় নারীদের মুক্তি আন্দোলনেও এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছিল। অসংখ্য মহিলা তাঁদের ক্ষমতা সম্পর্কে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠেন এবং নারীপুরুষের সমান অধিকার ও মর্যাদার কথা ভাবতে শুরু করেন।

গান্ধীর অভিমত ছিল, নারীদের অধিকার অর্জনের প্রতিবন্ধক হিসাবে অসংখ্য সামাজিক প্রথা ছড়িয়ে আছে, যথা, বাল্যবিবাহ, বৈধব্য, বিশেষতঃ শিশু বৈধব্য, বৈশ্যাবৃত্তি, কুসংস্কার, পর্দাপ্রথা, মদ্যপান এবং নারীর আর্থিক পরাধীনতা। গান্ধী সারাজীবন এই সব প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন। তিনি পরিবারে স্ত্রীর উপর স্বামীর প্রভুত্বের নিন্দা করে পরিবারে সাম্যের পরিবেশ সৃষ্টি করতে বলেছেন। একই সঙ্গে তাঁর অহিংসার নীতিও পরিবারের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা জরুরী বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। গান্ধী "মনুস্মৃতি" গ্রন্থে নারীদের সম্পর্কে প্রদত্ত বিধান তাঁদের পক্ষে চরম অবমাননাকর বলে মন্তব্য করেছেন। মোট কথা, মানুষের স্বাধীনতা ও সাম্যে বিশ্বাসী গান্ধী নারীদের ক্ষেত্রেও একই মনোভাব পোষণ করতেন এবং পরিবারে ও পরিবারের বাইরে তাঁদের পুরুষদের সঙ্গে একই আসনে বসাবার পক্ষপাতী ছিলেন।

৪২.৬ গান্ধী : একবিংশ শতাব্দীতে প্রাসঙ্গিকতা

একবিংশ শতাব্দীতে গান্ধীর প্রাসঙ্গিকতা যথেষ্টই রয়েছে। বিংশ শতাব্দীর কয়েকটি গুরুতর সমস্যা একবিংশ শতাব্দীতেও থেকে যাবে। সেই সমস্যাগুলি সম্পর্কে গান্ধীর মূল্যবান চিন্তা-ভাবনা অনুধাবন করলে একবিংশ শতাব্দীতেও তাঁর প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকে না।

প্রথমতঃ রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ দ্রুত হারে বাড়ছে। ফলে কেন্দ্রীভূত বিশাল রাষ্ট্রের আধিপত্যও ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। এইভাবে ব্যক্তির স্বাধীনতা দিন দিন কমছে। গান্ধী এই সংকটের প্রতিবিধান হিসাবে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের কথা বলেছেন। তাঁর পঞ্চায়েত সরকার ব্যবস্থা সমাজের নীচু থেকে উঁচু অবধি সমস্ত স্তরে ক্ষমতা ছাড়িয়ে দেবার কথা বলেছে।

দ্বিতীয়তঃ আধুনিক অর্থনীতির বিশ্বায়ন (Globalization of the modernized economy) সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে গান্ধী বলেছিলেন, এর ফলে অর্থনৈতিক কুফলই শুধু দেখা দেয় তাই নয়, সংস্কৃতির বিশ্বায়নও (Globalization of culture) ঘটে। এর ফলে অঞ্চল ভেদে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ধ্বংস হয় এবং একইরকম সংস্কৃতি বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। গান্ধী বরাবরই বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণের উপর খুব গুরুত্ব দিয়েছেন। কারণ তিনি মনে করতেন ব্যক্তির স্বনির্ভরতা (Autonomy) রক্ষার জন্য এর প্রয়োজনীয়তা আছে। গান্ধীর এই সব চিন্তাধারা একবিংশ শতাব্দীতে যথেষ্ট মনোযোগ আকর্ষণ করবে।

তৃতীয়তঃ গান্ধী পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে মৌলিক বক্তব্য রেখেছেন। তাঁর ভাষায়, "বর্তমানে ভোগপ্রধান সমাজের পরিবেশ সম্পর্কে দায়বদ্ধতার অনুভূতি নেই এবং গান্ধী এই ধরণের নৈতিক উদাসীনতার মোকাবিলা করতে ইচ্ছুক।" ("Today's consumer society has little sense of obligation to the environment, and Gandhi wants to challenge this kind of moral apathy".) গান্ধী পরিবেশ দূষণের মূল প্রতিকার হিসাবে বলেছিলেন, জনগণ নৈতিক কর্তব্য হিসাবে স্বেচ্ছায় ভোগের আকাঙ্খা কমিয়ে আনবে; এইভাবে প্রাকৃতিক সম্পদের যথেষ্ট লুণ্ঠন বন্ধ হবে এবং মানুষ, অন্যান্য প্রানী, অরণ্য, পর্বত, সমুদ্র সবাইকে নিয়ে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করা যাবে। গান্ধীর এই আত্মসংযমের নৈতিক তত্ত্ব হয়ত অনেকের কাছে বাস্তবমূল্যহীন মনে হতে পারে। কিন্তু একবিংশ শতাব্দীতে যখন ক্রমেই পরিবেশ দূষণের সমস্যা তীব্রতর হবে তখন গান্ধীর বক্তব্য অনেক বেশি গুরুত্ব পাবে।

চতুর্থতঃ গান্ধীর অহিংসা-সম্পর্কিত চিন্তাধারা একবিংশ শতাব্দীতেও — যখন পারমাণবিক বিশ্বযুদ্ধের আশংকা এবং আঞ্চলিক সংঘাতের আশংকা পাশাপাশি থেকেই যাবে প্রাসঙ্গিকতা হারাবে না। আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী, এই বক্তব্য মানতে গান্ধী কোনদিনই রাজী ছিলেন না। হিংসাকে বাদ দিয়ে কোন পদ্ধতিতে আন্তর্জাতিক সংঘাতের সমাধান করা যায় গান্ধী সেই কথাই ভেবেছেন। সেই সঙ্গে এই চিন্তাও করেছেন, রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থাকে কিভাবে এমন করে পুনর্গঠিত করা যায় যাতে হিংসা সৃষ্টিকারী পরিস্থিতিকেই বাতিল করে দেওয়া সম্ভব হয়।

যাইহোক্, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, উপরিউল্লিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে গান্ধীর চিন্তাভাবনা একবিংশ শতাব্দীতেও প্রাসঙ্গিকতা হারাবে না।

৪২.৭ গান্ধী : সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন

বিংশ শতাব্দীতে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহামানব গান্ধীর মূল্যায়ন করা সহজ নয়, তবুও তাঁর সংক্ষিপ্ত মূল্যায়নের চেষ্টা করা যেতে পারে।

প্রথমতঃ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের মহানায়ক হিসাবে প্রায় তিন দশকের অধিককাল ধরে গান্ধীর ভূমিকা এক কথায় অবিস্মরণীয়। ১৯১৫ সালে তিনি যখন দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে আসেন তখন নরমপন্থী এবং চরমপন্থীদের পারস্পরিক বিরোধে স্বাধীনতা আন্দোলন বিভ্রান্ত ও মৃতপ্রায়। গান্ধীর অহিংস সত্যাগ্রহের আদর্শ স্বাধীনতা আন্দোলনে পুণরায় প্রাণ সঞ্চার করে তাকে এক নতুন পথের সন্ধান দিল। গান্ধীর সত্যাগ্রহ আদর্শের নিজস্ব নৈতিক মূল্য ছাড়াও এক অভিনব সামাজিক-রাজনৈতিক কর্মপদ্ধতি হিসাবেও এর অসামান্য গুরুত্বকে স্বীকার করতে হয়। এশিয়া আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে স্বাধীনতার আন্দোলনকারীরা গান্ধী-প্রদর্শিত সত্যাগ্রহ পদ্ধতি সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগ করেছেন।

দ্বিতীয়তঃ সমাজ সংস্কারক হিসাবে গান্ধীর ভূমিকা অতুলনীয়। তিনি সঠিকভাবেই বুঝেছিলেন যে অচল, অনড়, কুসংস্কারগ্রস্ত ভারতীয় সমাজের আমূল সংস্কার না করলে ভারতকে বিদেশী শাসনমুক্ত করে

কোন লাভ হবে না। দেশ অন্ধকারেই থেকে যাবে। অস্পৃশ্যতা, জাতিভেদ প্রথা, নারীদের প্রতি বৈষম্য, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ — এই সব সামাজিক কলঙ্ক মোচনের জন্য তিনি সারাজীবন ধরে তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছিলেন। বস্তুতঃ অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তিনি তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের মহানায়ক গান্ধীকে আমরা এক অসামান্য সমাজ সংস্কারক হিসাবেও দেখতে পাই।

তৃতীয়তঃ বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব গান্ধীর একবিংশ শতাব্দীতেও যথেষ্ট প্রাসঙ্গিকতা থাকবে। (এখানে ২.১২ অংশের আলোচনা লিখুন।)

চতুর্থতঃ গান্ধীর অনন্য বৈশিষ্ট্য হ'ল, সত্য, বিশ্বাস, অহিংসা, সাম্য — এই সমস্ত আদর্শকে (ideals) তিনি নির্দ্বিধায় তাঁর ব্যক্তিগত জীবন এবং রাজনৈতিক জীবনে একই সাথে প্রয়োগ করেছেন। সম্ভবতঃ সমগ্র বিশ্বে তিনিই একমাত্র নেতা যিনি তাঁর প্রতিটি ঘোষিত ধারণা ও বিশ্বাস নিজের জীবনে প্রয়োগ করেছেন। তা করতে গিয়ে তাঁকে ব্যক্তিগত জীবনে বহু শোক ও দুঃখ বরণ করতে হয়েছে। তথাপি তিনি পথচ্যুত হন নি। শুধু তাঁর পক্ষেই বলা সম্ভব ছিল, "আমার জীবনই আমার বাণী।" রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এইসব আদর্শ প্রযোজ্য নয়, সব রাজনীতিজ্ঞদের এই সাবধান বাণী গান্ধী গ্রহণ করেন নি — এইখানেই তাঁর অভিনবত্ব। এই প্রসঙ্গে Dennis Dalton মন্তব্য করেছেন, "গান্ধীর তিনদশক ব্যাপী জাতীয় নেতৃত্ব এই ইঙ্গিত দেয় যে রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাই হল আদর্শ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করবার একেবারে সঠিক স্থান।" ("Gandhi's three decades of national leadership suggest that political experience may serve as precisely the right place for testing or perfecting ideals".)।

গান্ধী মনে করতেন, সত্যাগ্রহীর বৈশিষ্ট্য হল, সে মানুষকে বিশ্বাস করবে, এমন কি প্রতিপক্ষের প্রতিও তার বিশ্বাস থাকবে। গান্ধীর মতে,অবিশ্বাস হল দুর্বলতার লক্ষণ এবং সত্যাগ্রহে দুর্বলতার স্থান নেই, সত্যাগ্রহী সবল ও ভয়মুক্ত। গান্ধী তাঁর ব্যক্তিগত ও প্রকাশ্য জীবনে সততা ও বিশ্বাসকে সমান গুরুত্ব দিয়েছেন; বিনিময়ে তিনি জনগণের অসীম বিশ্বাস অর্জন করেছেন।

পরিশেষে বলা যায়, মহামানব গান্ধীর অবদান শুধু ভারত ভূখন্ডেই সীমাবদ্ধ নেই, সমস্ত বিশ্বে ছড়িয়ে আছে। মানব সভ্যতায় তাঁর অবদানের কথা বিশ্ববাসী চিরকাল মনে রাখবে।

৪২.৮ সারাংশ

১৯১৫ সালে গান্ধী দক্ষিণ-আফ্রিকা থেকে ভারতে আসেন। তারপর প্রায় তিনদশক ধরে তিনি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রধান নেতার ভূমিকা পালন করেন। গান্ধী শুধু অহিংস আন্দোলনে বিশ্বাসী ছিলেন তাই নয়; অহিংসা স্বনির্ভরতা, সত্য, স্বাধীনতা, সাম্য — এই সমস্ত আদর্শকে তিনি সাফল্যের সঙ্গে রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন।

গান্ধীর ধারণায় কেবল ব্রিটিশ শাসনমুক্ত হলেই ভারতের স্বরাজ আসবে না। প্রকৃত স্বরাজ আনতে হলে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও আত্মিক স্বাধীনতাও প্রয়োজন। স্বরাজের লক্ষ্যে পৌঁছবার পদ্ধতি হল সত্যগ্রহ। সত্যগ্রহের অর্থ হ'ল, প্রতিবাদকারী অন্যায়ের বিরুদ্ধে অহিংস ও নৈতিক প্রতিবাদ জানাবে, প্রতিপক্ষকে আঘাত করে নয়, নিজে ত্যাগ ও দুঃখবরণ করে। উদ্দেশ্য, প্রতিপক্ষের বিবেকবুদ্ধি জাগ্রত করা। গান্ধী সর্বোদয় বলতে বুঝেছেন, প্রতিটি ব্যক্তির সর্বার্থে মঙ্গল অর্থাৎ বৈষয়িক, আত্মিক সব দিকে থেকে তার সামগ্রিক জীবনের সুষম বিকাশ। যে সমাজব্যবস্থায় সর্বোদয় সম্ভব সেই সমাজব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হ'ল — অহিংসা, সম্প্রীতি, সাম্য, নতুন মূল্যবোধ, আত্মসংযম, কায়িক পরিশ্রম ও বিকেন্দ্রীকরণ।

গান্ধী সারাজীবন অহিংসার পূজারী ছিলেন। তিনি মনে করতেন, রাষ্ট্রের প্রকৃতিই হল পীড়নমূলক ও হিংসাত্মক। সুতরাং গান্ধী রাষ্ট্রবিরোধী ছিলেন। তিনি আধুনিকতা ও আধুনিকীকরণের অনেক সুবিধা স্বীকার করে নিয়েও এর কুফল সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন, যথা, মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রের ঢালাও উৎপাদন, কর্মহীনতা, কর্মে বৈচিত্র্যহীনতা, মানুষের নিঃসঙ্গতাবোধ, আঞ্চলিক সংস্কৃতি বিপন্ন হয়ে পড়া ইত্যাদি।

গান্ধী অছিব্যবস্থার মাধ্যমে অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তিনি পুঁজিপতিদের কাছে আবেদন করেছিলেন, তাঁরা যেন তাঁদের ব্যক্তিগত সম্পত্তির একটা অংশ অছিব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করে। এই অছিব্যবস্থা জনসাধারণের মধ্যে অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করবে। স্বাধীনতা আন্দোলনের পুরোধা নেতা গান্ধী সমাজসংস্কারক হিসাবেও খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। কারণ তিনি জানতেন, ব্যাপক সমাজ সংস্কার ব্যতীত রাজনৈতিক স্বাধীনতা মূল্যহীন হয়ে পড়ে। তিনি জাতিভেদ প্রথা, অস্পৃশ্যতা, নারীমুক্তি বিষয়ে ব্যাপক আন্দোলন সৃষ্টি করেছিলেন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার্থে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয় এবং দৃষ্টান্তবিহীন। বস্তুতঃ এই অবদানের কারণেই তাঁকে শহীদের মত্যুবরণ করতে হয়। একবিংশ শতাব্দীতে গান্ধীর প্রাসঙ্গিকতা পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়, যদি একবিংশ শতাব্দীতেও বিশ্বময় বজায় থাকবে এমন চারটি সমস্যা সম্পর্কে তাঁর অমূল্য চিন্তাধারা আমরা স্মরণ করি। সেগুলি হল— (১) রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ, (২) আধুনিক অর্থনীতির বিশ্বায়ন, (৩) পরিবেশ দূষণ, (৪) হিংসা ও সংঘাত। এই সঙ্গে স্মরণে রাখতে হবে আমাদের দেশে অস্পৃশ্যতা, নারীর পরাধীনতা, বিশ্বায়নের মুখে এদেশের নানা আঞ্চলিক সংস্কৃতির বিপন্নতা ইত্যাদির কথা এবং এইসব বিষয়ে গান্ধীর অসামান্য ভাবনা-চিন্তা ও দিশা প্রদর্শনের কথা।

গান্ধীর মূল্যায়ন করতে হলে তাঁর কর্মজীবনের কয়েকটি দিকের কথা ভাবা দরকার। প্রথমতঃ, স্বাধীনতা আন্দোলনের মহানায়ক; দ্বিতীয়তঃ, অসাধারণ সমাজসংস্কারক; তৃতীয়তঃ একবিংশ শতাব্দীতে প্রাসঙ্গিকতা এবং চতুর্থতঃ, সত্য, অহিংসা ইত্যাদি কিছু আদর্শের ব্যক্তিগত এবং রাজনৈতিক জীবনে একই

সাথে প্রয়োগ। এইসব বিবেচনা করে দ্বিধাহীনভাবেই বলা যায় ভারত তথা বিশ্বের কল্যাণে গান্ধীর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এবং যত দিন যাবে তাঁর প্রাসঙ্গিকতা ততই বৃদ্ধি পাবে। তাঁর মৃত্যুর বহুকাল পরে যেভাবে দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবৈষম্যের অবসান করে অহিংস বিপ্লব ঘটে গেল, অথবা যেভাবে প্যালেস্টাইন সমস্যা ক্রমাগত সমাধানের দিকে এগোচ্ছে, তা দেখে এই বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়। একথা বলাই যায় যুগ যুগ ধরে বিশ্ববাসীর অন্তরে তাঁর জন্য শ্রদ্ধার আসন পাতা থাকবে।

৪২.৯ অনুশীলনী

ক) গান্ধী পরিকল্পিত অছি ব্যবস্থা সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

খ) গান্ধীর সমাজসংস্কার বিষয়ে ভাবনার পর্যালোচনা করুন।

গ) জাতিভেদ প্রথা সম্পর্কে গান্ধীর কি দৃষ্টিভঙ্গী ছিল?

ঘ) অস্পৃশ্যতা প্রসঙ্গে গান্ধীর ভাবনা সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

ঙ) গান্ধীর নারীমুক্তি সম্পর্কে ধারণার উপর একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন।

চ) একবিংশ শতাব্দীতে গান্ধীর প্রাসঙ্গিকতা বিষয়ে আলোচনা করুন।

ছ) গান্ধীর কর্মজীবন ও চিন্তাধারার সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন করুন।

৪২.১০ গ্রন্থপঞ্জী

1) Bhikhu Parekh : "Gandhi's Political Philosophy." (Notre Dame : University of Notre Dame Press, 1989).

2) B.R. Nanda : "Mahatma Gandhi." – (Bombay : Allied Publishers, 1958)

3) Dennis Dalton : "Mahatma Gandhi – Non-violent Power in Action." (New York : Columbia University Press, 1993).

4) Dennis Dalton ed. : "Mahatma Gandhi – Selected Political Writings." (Indianapolis Cambridge : Hackett, 1996).

5) Raghavan N. Iyer : " The Moral and Political Thought of Mahatma Gandhi" (Oxford / London : Oxford University Press, 1978).

6) Ronald J. Terchek : " Gandhi– Struggling for Autonomy." (Lanham / New York : Rowman & Littlefield, 1998).

7) Ronald J. Terchek and Nitis Das Gupta : " Gandhi and the Autonomous Woman", "Gandhian Studies", Vol. 2, No. 1, July- December, 1997, 23-42.

8) E. Stanley Jones : "Mahatma Gandhi – An Interpreter" (London : Hodder and Stoughton, 1948), p. 179.

9) B. R. Nanda : "Mahatma Gandhi", p. 121.

10) Ronald J. Terchek : "Gandhi – Struggling for Autonomy", p. 235.

11) Dennis Dalton : "Mahatma Gandhi – Non-violent Power in Action", p. 199.

একক ৪৩ □ ভীমরাও রামজী আম্বেদকর

গঠন

৪৩.০ উদ্দেশ্য
৪৩.১ প্রস্তাবনা
৪৩.২ আম্বেদকর : জীবন ও কর্ম
৪৩.৩ আম্বেদকর : সামাজিক চিন্তাধারা
৪৩.৪ আম্বেদকর : অর্থনৈতিক চিন্তাধারা
৪৩.৫ আম্বেদকর : রাজনৈতিক চিন্তাধারা
৪৩.৬ আম্বেদকর : সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন
৪৩.৭ সারাংশ
৪৩.৮ অনুশীলনী
৪৩.৯ গ্রন্থপঞ্জী

৪৩.০ উদ্দেশ্য

একক ৪৩ লেখা হয়েছে ভারতের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সংবিধান বিশেষজ্ঞ, অসাধারণ সাংগঠনিক প্রতিভার অধিকারী এবং বঞ্চিত-শোষিত জনগণের মহান নেতা ভীমরাও রামজী আম্বেদকরের অসামান্য কর্মজীবন এবং সুগভীর চিন্তাধারা সম্পর্কে । এই একক পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন :

- আম্বেদকরের বলিষ্ঠ জীবন সংগ্রামের কথা।
- দেশ-বিদেশের শিক্ষা জগতে তাঁর বহু সম্মান লাভের কথা।
- তাঁর অমূল্য সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা।
- পশ্চাৎপদ জনগণের নেতা হিসাবে সারাজীবনব্যাপী তাঁর বিশাল কর্মকান্ডের কাহিনী।
- ভারতীয় সংবিধানের রূপকার হিসাবে তাঁর গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার কথা।

৪৩.১ প্রস্তাবনা

বিংশ শতাব্দীতে ভারতমাতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুসন্তান ভীমরাও রামজী আম্বেদকর (১৮৯১-১৯৫৬) অসাধারণ খ্যাতি অর্জন করেন তথাকথিত অস্পৃশ্যদের নেতা এবং স্বাধীন ভারতের সংবিধানের রূপকার হিসাবে। জওহরলাল নেহরু তাঁকে হিন্দুসমাজের সমস্ত দমনকারী শক্তির বিরুদ্ধে "বিদ্রোহের প্রতীক" বলে সম্মানিত করেন। আম্বেদকরের কর্মজীবন প্রায় পঞ্চাশ বছর পরিব্যাপ্ত ছিল। এই দীর্ঘ সময়ে তিনি তাঁর

নিজের মহার বর্ণভুক্ত এবং অন্যান্য অনেক অস্পৃশ্য বর্ণভুক্ত জনতাকে সংগঠিত করে আন্দোলন করেন। তিনটি রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমে পরাধীন ও পরে স্বাধীন ভারতের ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসাবে কাজ করেন এবং বিস্তারিতভাবে দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত মতামত প্রচার করেন ও লেখেন। আম্বেদকরের জীবন বলিষ্ঠ আত্মবিশ্বাস, রক্ত-ঘাম-ঝরা জীবনযুদ্ধ এবং নীচুতলার স্বজনদের প্রতি গভীর মমতাবোধের এক আশ্চর্য নিদর্শন।

৪৩.৩ আম্বেদকর : জীবন ও কর্ম

১৮৯১ সালের ১৪ই এপ্রিল মধ্য প্রদেশের মহাউ (এখন মাহু) অঞ্চলে আম্বেদকরের জন্ম হয়। তিনি মহার বর্ণভুক্ত ছিলেন এবং তাঁর পিতা রামজী মালোজী আম্বেদকর ছিলেন সেখানকার সামরিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। আম্বেদকর নিম্নবর্ণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন বলে নানারকম সামাজিক বৈষম্যের শিকার হয়েছেন, কিন্তু তাঁকে তাঁর গ্রাম থেকে প্রথাগত পেশা গ্রহণ করতে হয়নি। ডাপলিতে স্থানীয় বিদ্যালয়ে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং পরে সাতারার সরকারী বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন। বিদ্যালয় জীবনে অস্পৃশ্য বর্ণভুক্ত বলে তিনি নানাভাবে অসম্মানিত হন। সহপাঠিরা তাঁর সঙ্গে খেলতে চায় না। শিক্ষকেরা তাঁর বই, খাতা স্পর্শ করতে অস্বীকার করেন। সংস্কৃত ভাষা পড়তে আগ্রহী হলেও তার বদলে পার্শি পড়তে বাধ্য হন। এই ভাবে অপমানের আগুনে দগ্ধ হতে হতে ভবিষ্যৎ ভারতের নিম্নবর্ণভুক্তদের অবিসম্বাদী নেতার চরিত্র ইস্পাত কঠিন রূপ ধারণ করতে থাকে।

১৯১৩ সালে আম্বেদকর বম্বের এলফিনস্টোন কলেজ থেকে স্নাতক হন। বরোদার মহারাজা গাইকোয়াড়ের সাহায্যে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং সেখান থেকে পি. এইচ. ডি. অর্জন করেন। তারপর কোলাপুরের মহারাজার পৃষ্ঠপোষকতায় আম্বেদকর লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়নের সুযোগ পান এবং সেখান থেকে ডি. এস. সি. লাভ করেন এবং ব্যারিস্টারিও পাশ করেন। এইভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইংল্যান্ড দুবার যাতায়াত করে আম্বেদকর বিদেশে শিক্ষাগ্রহণ সমাপ্ত করে ১৯২৩ সালে ভারতে ফিরে আসেন।

১৯৩০-৩২ সালে লন্ডনে গোলটেবিল বৈঠকের তিনটি অধিবেশনেই আম্বেদকর নিম্নবর্ণভুক্ত ব্যক্তিদের প্রতিনিধি হিসাবে যোগ দেন। তখন নিম্নবর্ণের স্বতন্ত্র নির্বাচনী এলাকা নিয়ে গান্ধী-আম্বেদকরে বিরোধ হয়। এই বিরোধ চূড়ান্ত রূপ নেয় ১৯৩২ সালে যখন ব্রিটিশ সরকার নিম্নবর্ণের স্বতন্ত্র নির্বাচনী এলাকা ঘোষণা করে। গান্ধী ১৯৩২ সালে পুনের কারাগারে এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে আমৃত্যু অনশনের সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর অভিমত ছিল এর ফলে হিন্দু সমাজ থেকে নিম্নবর্ণভুক্তগণ একেবারে দূরে সরে যাবেন। যাইহোক্, গান্ধীর স্বাস্থ্যের অবনতি হতে থাকায় পুণের চুক্তি হল এবং আম্বেদকর স্বতন্ত্র নির্বাচনী এলাকার দাবী ছাড়তে রাজী হলেন। কিন্তু দুটি শর্ত তিনি আরোপ করেন — (১) অস্পৃশ্যতা দূর করতে গান্ধী ও তাঁর অনুগামীগণ সাহায্য করবেন; (২) সমস্ত নির্বাচিত রাজনৈতিক সংস্থায় অস্পৃশ্যদের সংরক্ষিত আসন থাকবে। এই পুণে চুক্তি

আম্বেদকরের নেতৃত্বের বিশেষ সাফল্যের পরিচায়ক। এই প্রথম ভারতের রাজনৈতিক কার্যকলাপে নিম্নবর্ণভূক্তদের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত হল।

১৯৩৭ সালের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার উদ্দেশ্য নিয়ে আম্বেদকর "Independent Labour Party" প্রতিষ্ঠা করেন। পার্টির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হয়েছিল — শুধু নিম্নবর্ণের উন্নতিসাধনই নয়, "মূলতঃ শ্রমিকশ্রেণীর উন্নতিসাধানই লক্ষ্য থাকবে। আরও বলা হয়েছিল, জনস্বার্থে শিল্পের রাষ্ট্রীয় মালিকানার নীতি গ্রহণ করতে হবে।

১৯৪২ সাল থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত Viceroy's Executive Council-এ শ্রমমন্ত্রী হিসাবে কাজ করার সময় আম্বেদকর শুধু মহার এবং অন্যান্য তফশিলভুক্ত বর্ণের জন্য কল্যাণমূলক কাজই করেন নি, সাধারণ শ্রমিকদের স্বার্থের অনুকূলে শিল্প-সালিশী সংক্রান্ত আইন ও অন্যান্য শ্রম আইন প্রবর্তন করার চেষ্টাও করেন। ১৯৪৬ সালে তিনি গণপরিষদে নির্বাচিত হন। আম্বেদকর কংগ্রেস দলের কঠোর সমালোচক হলেও ১৫ই আগস্ট ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হবার পর তিনি প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর ক্যাবিনেটে শ্রমমন্ত্রী হিসাবে যোগ দেন। সেই সাথেই তাঁকে গণপরিষদের সংবিধান খসড়া কমিটির সভাপতির দায়িত্ব-ভারও দেওয়া হয়।

অবশ্য ভারতীয় সংবিধানে আম্বেদকরের ধ্যান-ধারণা থেকে অনেক বেশী প্রতিফলিত হয়েছে কংগ্রেসের মতাদর্শ। তবুও সংবিধানের কিছু ক্ষেত্রে স্পষ্টভাবে আম্বেদকরের অবদান প্রত্যক্ষ করা যায়। যেমন, তফশিলী বর্ণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা, অস্পৃশ্যতাকে বেআইনী ঘোষণা, গণতন্ত্র রক্ষার প্রয়োজনে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার, স্বতন্ত্র বিচার ব্যবস্থা, মৌলিক অধিকারের মধ্যে সাম্যের অধিকারের অন্তর্ভুক্তি ইত্যাদি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, আম্বেদকরকে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫২ সালে ভারতীয় সংবিধান রচনায় অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য আইন বিষয়ক সর্বোচ্চ ডিগ্রী "ডক্টর অফ ল" প্রদান করে।

দীর্ঘদিন ধরে হিন্দু সমাজের মনুবাদী কাঠামো ভেঙে বর্ণভেদ তথা জাতপাত ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে দলিত সমাজের মুক্তির চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত আম্বেদকর শুধু ব্যর্থতার স্বাদই পান। হিন্দু সমাজের বাইরে সাম্যের খোঁজ বেরিয়ে বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকেন। বস্তুতঃ ১৯৪৮ সাল থেকেই বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের কথা ভাবছিলেন তিনি। ১৯৫৬ সালের অক্টোবরে নাগপুরে তিনি কয়েক হাজার তফশিলী বর্ণভুক্ত অনুগামীসহ বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে তিনি এই পথ গ্রহণ করেন। ন্যায়বিচারের স্বপক্ষে সমাজ বদলের সংগ্রাম এর পর আর বেশিদিন তিনি চালাতে পারেন নি। ১৯৫৬ সালের ৬ই ডিসেম্বর আম্বেদকরের জীবনাবসান হয়।

অনুশীলনী — ১

বড় প্রশ্ন :

ক) আম্বেদকরের জীবন ও কর্ম পর্যালোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

খ) আম্বেদকর বিদেশে কোথায় কি কি ডিগ্রী অর্জন করেছিলেন?

গ) গান্ধী-আম্বেদকর পুনা চুক্তি কি ?

ঘ) ভারতীয় সংবিধান রচনার জন্য কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় আম্বেদকরকে কোন্ সালে কি ডিগ্রী প্রদান করে?

ঙ) ভারতের সংবিধানের কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে আম্বেদকরের অবদান প্রত্যক্ষ করা যায়?

৪৩.৪ আম্বেদকরের সামাজিক চিন্তাধারা

আম্বেদকর নিম্নবর্ণভুক্তদের সামাজিক দুর্দশা ও গ্লানির জন্য হিন্দুধর্মের বর্ণব্যবস্থাকে দায়ী করেছেন; তাঁর মতে বিদেশী শাসকের শোষণ এবং জাতীয় নেতাদের ভ্রান্ত রাজনীতি এই দুর্দশাকে আরও তীব্র করে তুলেছিল। কর্মের ভিত্তিতে মনু যে বর্ণব্যবস্থা সৃষ্টি করেছেন তাকে "এক ধরণের রাজনৈতিক ধাপ্পাবাজির খেলা" ("a kind of political jugglery") বলে অভিহিত করে আম্বেদকর বলেছেন এর আসল উদ্দেশ্য হল নিম্নবর্ণের উপর উচ্চবর্ণের আধিপত্য ও অত্যাচার বংশানুক্রমে কায়েম করা। আম্বেদকরের মতে এই মানবতাবিরোধী ও অপরাধমূলক বর্ণব্যবস্থা হিন্দুধর্মে পরবর্তীকালে সৃষ্টি হয়েছে। হিন্দুশাস্ত্রে গভীর পান্ডিত্যের অধিকারী আম্বেদকর প্রমাণ করেছেন, ঋগবেদে শুদ্র বলে কোন বর্ণের অস্তিত্বই নেই। তিনি কৌটিল্য, ম্যাক্স্ ওয়েবায় ও ম্যাক্স্মুলারের রচনাবলীর দীর্ঘ বিশ্লেষণ করে একথাও প্রমাণ করেছেন যে আদি হিন্দুসমাজে শুদ্ররা ক্ষত্রিয়ের সম্মান পেতেন।

হিন্দুধর্ম পরবর্তীকালে যে জাতিভেদ প্রথা সৃষ্টি করেছিল তাকে মানবসভ্যতার কলঙ্ক মনে করা যেতে পারে। আম্বেদকরের ভাষায়," হিন্দু সভ্যতাকে কোন সভ্যতাই বলা চলে না। একে বলা উচিত মানবতাকে দমন ও শৃঙ্খলিত করার এক দানবিক কৌশল।"

সমাজতত্ত্ব ও পুরাতত্ত্বকে বিস্তারিত বিশ্লেষণ করে আম্বেদকর যুক্তি দিয়ে বুঝিয়েছেন, হিন্দু পন্ডিতদের বর্ণব্যবস্থা, কুল, গোত্র, আর্য-অনার্য সম্পর্কিত যাবতীয় তত্ত্ব কোন ঐতিহাসিক সত্য নয়, মিথ্যাচার ও প্রতারণা মাত্র। শৈশবে ও যৌবনে নিম্নবর্ণের ব্যক্তি হিসাবে পীড়ন ও নিগ্রহের অসংখ্য তিক্ত স্মৃতি তাঁকে এই জাতীয় তথ্যনিষ্ঠ গবেষণায় অনুপ্রাণিত করেছে।

নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, আম্বেদকর দলিত শ্রেণী তথা পিছিয়ে পড়া মানুষদের সেবায় জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তিনি 'বহিস্কৃত হিতকারিণী সভা' গঠন করেছেন, বিভিন্ন পত্রিকায় দীপ্ত ভাষায় প্রবন্ধ লিখেছেন, তাদের জন্য সত্যগ্রহ আন্দোলন করেছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য তাঁর নেতৃত্বে ১৯২৭ সালের ২৫ ডিসেম্বর মহারাষ্ট্রের চাভাদর সরোবরের সত্যাগ্রহ। এই সরোবরের জল সব শ্রেণী ও ধর্মের লোকেরাই পান করতে পারত। পশুরাও পারত। এর জল স্পর্শ করাও নিষিদ্ধ ছিল শুধু দলিতদের ক্ষেত্রে। ওইদিন কয়েক হাজার দলিত আম্বেদকরের নেতৃত্বে ওই সরোবরের তীরে হাজির হয়ে তার জল পান করেন। ঠিক

যেমন গান্ধীর নেতৃত্বে হাজার হাজার ভারতীয় লবন সত্যাগ্রহে যোগ দিয়ে লবন তৈরি করেছিল। জল পানের পর দলিতরা তাঁদের দাসত্বের মতাদর্শগত উৎস মনুস্মৃতি ওই সরোবরের তীরেই দহন করেন।

একদিকে ব্রিটিশ সরকার অন্যদিকে গান্ধী ও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। ভাইসরয়ের ক্যাবিনেটের সদস্য হিসাবে তাদের আর্থিক-সামাজিক উন্নতির চেষ্টা করেছেন এবং জীবনের শেষভাগে গণপরিষদের খসড়া কমিটির সভাপতি হিসাবে সংবিধানের মাধ্যমে তাদের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছেন। একথাও পরিস্কার হওয়া দরকার, আম্বেদকর আজীবন শুধু নিম্নবর্ণের স্বার্থের কথাই ভাবেন নি, তিনি সামগ্রিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষের ("downtrodden people") স্বার্থের কথাই মনে রেখেছেন।

আম্বেদকর গান্ধীর অস্পৃশ্যতা বিরোধী মনোভাবকে স্বীকৃতি দিলেও হৃদয়ের পরিবর্তনের সাথে অস্পৃশ্যতারও অবলুপ্তি হবে গান্ধীর এই বিশ্বাসের অংশীদার ছিলেন না। তিনি মনে করতেন, বর্ণব্যবস্থা মানুষ সৃষ্টি করেছে এবং মানুষকেই তা অবলোপ করতে হবে। অন্যকথায়, আম্বেদকর নৈতিক আবেদনের মাধ্যমে নয়, আইনের সাহায্যে অস্পৃশ্যতা অবলোপ এবং নিম্নবর্ণভুক্তদের সুযোগ সুবিধা দানে আস্থাশীল ছিলেন। বস্তুতঃ এ বিষয়ে তিনি অনেকটাই সফল। কারণ স্বাধীন ভারতে অস্পৃশ্যতা আইনতঃ নিষিদ্ধ করে দন্ডমূলক অপরাধ হিসাবে ঘোষিত হয়েছে। সেইসাথে নির্বাচন, শিক্ষা, চাকরী ইত্যাদি নানাক্ষেত্রে নিম্নবর্ণভুক্ত বা তফশিলী বর্ণভুক্তদের প্রতি সরকার ''সুবিধাদানের জন্য বৈষম্যমূলক নীতি'' ("policy of compensatory discrimination") গ্রহণ করেছে।

আম্বেদকরের স্বচ্ছ দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল যে পিছিয়ে পড়া মানুষদের সামাজিক দুঃখ-কষ্ট দূর করার সমস্যাটি শুধু অর্থনৈতিক নয়, শিক্ষাগতও। শিক্ষা না পেলে চেতনা জাগে না। পাছে শুদ্রদের মনে চেতনা জাগে সেই জন্যে তাদের চিরকাল শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে। ব্রাহ্মণ্যবাদীরা তথা মনুস্মৃতি শুদ্রদের বেদপাঠ এমনকি শ্রবণও মহাপাপ বলে ঘোষণা করেছিল। অথচ শিক্ষা ও চেতনা ছাড়া কেউ আত্মসম্মান অর্জনের সংগ্রাম করতে পারে না। সেই জন্যেই আম্বেদকর বুঝেছিলেন, শুধু সাক্ষরতা নয়, চাই উচ্চশিক্ষা যা তাদের আত্মসচেতন করবে, নিজেদের মানুষ হিসাবে ভাবতে শেখাবে। আম্বেদকর মন্তব্য করেছেন,''নিম্নবর্ণের উন্নতির সমস্যাকে মনে করা হয় অর্থনৈতিক। একে মস্ত ভুল বলা যায়। ..... সমস্যাটি হচ্ছে তাদের মন থেকে দুর করতে হবে হীনমন্যতাবোধ যা তাদের উন্নতির অন্তরায় হয়ে অপরের দাসানুদাস করে রেখেছে। .....উচ্চশিক্ষা বিস্তার ছাড়া এই উদ্দেশ্য সফল হতে পারে না।'' ("The problem of raising the lower order is deemed to be economic. This is a great mistake ..... The problem is to remove from them that inferiority complex which has stunted their growth and made them slaves to others ..... Nothing can achieve this purpose except the spread of Higher education.")

শুধু বলে এবং লিখেই ক্ষান্ত হন নি তিনি। গ্রোপার্জিত অর্থ অকাতরে ব্যয় করে, নানাজনের কাছে ভিক্ষা করে অর্থ সংগ্রহ করে একের পর এক স্কুল, হস্টেল ও কলেজ স্থাপন করেন দলিত সন্তানদের জন্য।

তাঁর প্রতিষ্ঠিত মিলিন্দ কলেজের প্রথম স্নাতকদল (১৯৫০) হয়ে ওঠে মহারাষ্ট্রে দলিত মুক্তি আন্দোলন ও সেই আন্দোলনের মুখপাত্র দলিত সাহিত্যের প্রথম সংগঠক ও কর্মীদল।

৪৩.৫ আম্বেদকরের অর্থনৈতিক চিন্তাধারা

যদিও আম্বেদকর বিশ্বাস করতেন যে সামাজিক সংস্কার ছাড়া অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক সংস্কার সম্ভব নয়, তবুও তিনি অনগ্রসর মানুষদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনা করেছেন। আম্বেদকরের অভিমত ছিল, অবহেলিত কৃষক ও শ্রমিকদের মধ্যে দরিদ্রতম হল নিম্নবর্ণের মানুষেরা। কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রে ব্রিটেনের শোষণনীতি নিম্নবর্ণের মানুষসহ সমগ্র কৃষক ও শ্রমিক সমাজকে দুর্দশা ও বঞ্চনার শেষ প্রান্তে পৌঁছে দিয়েছে। ওদিকে "উচ্চবর্ণের জাতীয় নেতারা জাতীয় আন্দোলন পরিচালনা করতে গিয়ে আর্থিক সমস্যাকে একেবারেই প্রাধান্য দেন নি, তাঁদের মূল উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ সরকারের সাথে রাজনৈতিক দাবী নিয়ে দরাদরি করে নিজেদের ভবিষ্যত গুছিয়ে নেওয়া।

অনগ্রসর শ্রেণীর বিভিন্ন প্রাদেশিক ও সর্বভারতীয় সম্মেলনে আম্বেদকর সাধারণ কৃষকদের অর্থনৈতিক সমস্যাগুলিকে সুস্পষ্টভাবে সনাক্ত করে উপযুক্ত প্রতিকার দাবী করেছেন। তিনি জমিদারী, রায়তারী প্রথার বিরুদ্ধে এবং কৃষকদের জমির মালিকানা স্বত্ব স্বীকৃতির স্বপক্ষে ঐ সব সভায় জোরালো বক্তব্য রেখেছেন। বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে ভূমি থেকে রাজস্ব আদায় পদ্ধতির বিরুদ্ধে তিনি নিম্নবর্ণের কৃষকদের আন্দোলন করার ডাক দিয়েছেন। আম্বেদকর ১৯২৮ সালে একটি বিল এনে মহার সম্প্রদায়ভুক্ত চাষীদের যৎসামান্য অর্থের বিনিময়ে শৃঙ্খলিত শ্রমিক (Bonded Labour) হিসাবে কাজ করবার প্রথাকে বাতিল করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠের কায়েমী স্বার্থ এই বিল অনুমোদিত হতে দেয় নি।

আম্বেদকরের ধারণায় সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণীর শ্রমিক সংগঠনগুলি — যথা INTUC, AITUC ইত্যাদি— সাধারণ বঞ্চিত শ্রমিকদের স্বার্থ দেখে না। সেজন্য তিনি নিজেই "Independent Labour Party" নামে একটি শ্রমিকদল গঠন করেন। তিনি জমির উপর থেকে জনসংখ্যার চাপ কমাবার জন্য শিল্প বিকাশের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতেন। শিল্প ক্ষেত্রে তিনি শিল্পের রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও পরিচালনাই কাম্য মনে করতেন। শ্রমিকদের কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে তাঁর দল এক কর্মসূচী ঘোষণা করে। তার মধ্যে ছিল — জমি বন্ধকী ব্যাংক, শ্রমিক সমবায় এবং শ্রমিকদের জন্য বিক্রয় বাজার গড়ে তোলা, বিভিন্ন জনকল্যাণমুখী কাজের সঙ্গে শ্রমিকদের যুক্ত করা, শ্রমিকদের স্বার্থে কর ব্যবস্থার সংস্কার করা এবং শ্রমিকদের জন্য বাধ্যতামূলক প্রয়োজনীয় শিক্ষার আয়োজন করা। ১৯৩৮ সালে বোম্বাই আইনসভা অনুমোদিত "শিল্প বিরোধী সংক্রান্ত আইন"-কে শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী বলে তিনি সমালোচনা করেছিলেন এবং তার বিরুদ্ধে অন্যান্য শ্রমিক সংগঠনগুলির সঙ্গে মিলিতভাবে আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে গিয়েছিলেন।

অনুশীলণী — ২

বড় প্রশ্ন :

ক) আম্বেদকরের সামাজিক চিন্তাধারা ব্যাখ্যা করুন।

খ) আম্বেদকরের অর্থনৈতিক চিন্তাধারা পর্যালোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

গ) "সুবিধাদানের জন্য বৈষম্যমূলক নীতি" ("a policy of compensatory discrimination") কাকে বলে?

ঘ) আম্বেদকর কেন বলেছিলেন পিছিয়ে পড়া মানুষদের সামাজিক দুঃখ-কষ্ট দূর করার সমস্যাটি শুধু অর্থনৈতিক নয়, মূলতঃ শিক্ষাগত ?

ঙ) আম্বেদকর সাধারণ-কৃষকদের অর্থনৈতিক কল্যাণের জন্য কি কি দাবী তুলেছিলেন?

চ) "Independent Labour Party" কি উদ্দেশ্যে, কে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ?

৪৩.৬ আম্বেদকরের রাজনৈতিক চিন্তাধারা

আম্বেদকরের রাষ্ট্রদর্শন অনুসারে রাষ্ট্র ব্যক্তির জীবন, সুখ ও স্বাধীনতাকে রক্ষা করবে, ব্যক্তিকে দায়িত্ব সচেতন করবে এবং সামাজিক ও আর্থিক বৈষম্য দূর করবে। তিনি বলেছেন রাষ্ট্র লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য সাধনের উপায়মাত্র ("not an end in itself, but a means to an end.")।

তিনি গণতন্ত্রে বিশ্বাস করতেন; তবে এই গণতন্ত্র সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন নয়। তিনি সংখ্যালঘুর জন্য আসন সংরক্ষণ ব্যবস্থাও সমর্থন করেন নি। তাঁর ইচ্ছা ছিল ভোটাধিকারের ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতই সংখ্যালঘু একই মান ও মর্যাদাসম্পন্ন হবে। তবে সংখ্যাগরিষ্ঠের তুলনায় সংখ্যালঘুর ভোটাধিকারের ন্যূনতম বয়স কম থাকবে। উদ্দেশ্য, এইভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘু ভোটদাতাদের অনুপাত কমবে। তাঁর মতে আমাদের দেশে রাজনৈতিক সংখ্যাগরিষ্ঠ ("political majority") নেই, আছে বর্ণভিত্তিক সংখ্যাগরিষ্ঠ যারা জন্মের ভিত্তিতে চিরন্তন সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকে। কিন্তু রাজনৈতিক সংখ্যাগরিষ্ঠ সচল এবং পরিবর্তনশীল হয়। চিন্তা ও মত বিনিময়ের ভিত্তিতে এই রাজনৈতিক সংখ্যাগরিষ্ঠ এক সময়ে সংখ্যালঘুতেও পরিণত হতে পারে। আমাদের দেশের অচলায়তনে বর্ণভিত্তিক সংখ্যাগরিষ্ঠের অবসান না হলে প্রকৃত গণতন্ত্র কার্যকর হতে পারবে না।

তাঁর পরিকল্পিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কতগুলি বৈশিষ্ট্য আম্বেদকর সনাক্ত করেছেন — (১) সকলের গ্রহণযোগ্য আইন, (২) সরকার ও জনগণ উভয়েরই দায়িত্ববোধের বিকাশ, (৩) "প্রতিরোধ

ও ভারসাম্যের নীতি' অনুযায়ী শাসনব্যবস্থায় সংগঠন, (৪) প্রতিটি গোষ্ঠীর সমান প্রতিনিধিত্ব, (৫) নির্বাচনের ভিত্তিতে সরকার গঠন, (৬) বহুদলীয় দায়িত্বশীল ব্যবস্থা, (৭) রাজনৈতিক গণতন্ত্রের সমান্তরাল সামাজিক ও অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের উপস্থিতি। সর্বশেষ বৈশিষ্ট্যটি সম্পর্কে আম্বেদকর জোর দিয়ে বলেছেন, রাজনৈতিক সাম্যের সাথে যদি সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্যের সহাবস্থান হয়, তবে এই অসংগতির ফলে গণতন্ত্রের বুনিয়াদই ধ্বংস হয়ে যাবে।

পরিশেষে বলা যায় ভারতীয় সংবিধানের অন্যতম রূপকার হিসাবে সংবিধানে আম্বেদকরের কিছু নিজস্ব রাজনৈতিক চিন্তার স্পষ্ট ছাপ দেখা যায়। প্রথমতঃ শক্তিশালী ও দায়িত্বশীল কেন্দ্রীয় সরকার। তিনি মনে করতেন, অবহেলিত মানুষদের স্বার্থেই এর প্রয়োজনীয়তা আছে। দ্বিতীয়তঃ নাগরিকদের জন্য নির্দিষ্ট কিছু মৌলিক অধিকার। তৃতীয়তঃ রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিসমূহ যার উদ্দেশ্য হল, সাধারণ লোকের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতিসাধন। চতুর্থতঃ সংখ্যালঘুদের নানাবিধ সুবিধা প্রদান। পঞ্চমতঃ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা এবং তপশিলভুক্ত শ্রেণীগুলির জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা।

৪৩.৭ আম্বেদকর : সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন

ভীমরাও রামজী আম্বেদকর অনগ্রসর সমাজের প্রথম এমন একজন মানুষ যিনি তাঁদেরই একজন হিসাবে তাঁদের দুঃখ, দুর্দশা, অসহায়তা সঠিকভাবে উপলব্ধি করে সঠিক নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তিনি মহার সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। মহারাষ্ট্রের মহার-সহ অন্যান্য অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের মানুষদের সেই যুগে বর্ণহিন্দুরা পশুর থেকেও নীচুস্তরের জীব বলে মনে করত। এই সব মানুষদের গলায় মাটির পাত্র বা কোমরে ঝাঁটা ইত্যাদি বেঁধে প্রকাশ্যে বের হতে হত। বিদেশী ইংরাজ শাসক এবং দেশীয় উচ্চবর্ণের হিন্দুরা কেউই কারো স্বার্থ বিসর্জন দিতে রাজী ছিল না। ইংরাজরা তাদের অর্থনৈতিক শোষণের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য উপাদান হিসাবে এদের ব্যবহার করেছিলেন। একইভাবে উচ্চবর্ণের রাজনৈতিক নেতারা "আগে স্বাধীনতা পরে অন্যকথা" বুলির আড়ালে অবহেলিতদের সামাজিক অর্থনৈতিক সমস্যাকে লুকিয়ে রেখে রাজনৈতিক দাবি নিয়ে আন্দোলন করত। উদ্দেশ্য, নিজেদের ভবিষৎ গুছিয়ে নেওয়া। এইরকম পরিস্থিতিতে আম্বেদকরের আবির্ভাবকে একটি "ঐতিহাসিক প্রয়োজন" ("historical necessity") বলা যায়। উচ্চবর্ণের নেতাদের যাবতীয় দ্বি-চারিতা ও কপটতার মুখোশ খুলে দিয়ে বঞ্চিতদেরই একজন তাদের জ্বালা-যন্ত্রণার কথা বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন।

উচ্চবর্ণের নেতারা যতই অস্পৃশ্যতা ও বর্ণব্যবস্থার কুফল সম্পর্কে বলুন, তাঁদের কেউই আম্বেদকরের মত এ বিষয়ে বিধ্বংসী ও দীপ্ত সমালোচনা করেন নি। আম্বেদকরের মতে বর্ণব্যবস্থা শুধু অপরাধমূলক নয়, রাজনৈতিক ধাপ্পাবাজির খেলা এবং মানবসভ্যতার কলঙ্ক। পেছিয়ে পড়া মানুষদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এই কশাঘাতের একান্তই প্রয়োজন ছিল।

আম্বেদকর সম্পর্কে আর একটি কথা খুবই প্রাসঙ্গিক। তিনি নিঃসন্দেহে তাঁর সময়ে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পন্ডিত ছিলেন। কিন্তু সংগ্রামী জীবন যাঁদের তাঁরা কেবল পন্ডিত হন না, তাঁদের পান্ডিত্যকে, তাদের রচনাকে তাঁদের জীবনসংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। বহুক্ষেত্রেই এইসব রচনা "একাডেমিক গবেষণার" সীমার আবদ্ধ না থেকে হয়ে ওঠে আন্দোলনের দাবি সনদ। এই ভাবে আম্বেদকরের অবিস্মরণীয় রচনাবলী অনিবার্যভাবেই হয়ে ওঠে দলিত শ্রেণী তথা পিছিয়ে পড়া মানুষের মুক্তি সংগ্রামের ঐতিহাসিক তথা দার্শনিক ভিত্তি এবং তার দাবি সনদ । আম্বেদকরের বয়স যখন মাত্রই পঁচিশ তখনই প্রকাশিত হয় তাঁর লেখা বই 'কাস্টস্ ইন ইন্ডিয়া — দেয়ার মেকানিজম, জেনেসিস অ্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট (১৯১৬)। তারপর একে একে প্রকাশিত হতে থাকে 'অ্যানিহিলেশন অফ কাস্টস (১৯৩৬), 'হু অয়্যার দ্য শূদ্রজ' (১৯৪৮) ইত্যাদি গ্রন্থ।

এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, ভারতে সংখ্যালঘু রাজনীতির মূলধারাটি আম্বেদকরই প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি এ বিষয়ে অনেকটাই সফল; স্বাধীন ভারতের সংবিধানই তার প্রমাণ। কিন্তু তিনি বিচ্ছিন্নতাবাদকে কখনই সমর্থন করেননি,— তিনি চেয়েছিলেন, অনুন্নত সংখ্যালঘুদের উপযুক্ত সামাজিক-অর্থনৈতিক বিকাশ সাধন করে তাঁদের জনজীবনের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনা। আম্বেদকরের "রাজনৈতিক সংখ্যাগরিষ্ঠতা" প্রতিষ্ঠার আকাঙ্খাও তাঁর জাতীয় ঐক্য আদর্শের একটি প্রমাণ। তিনি বর্তমান ভারতে প্রচলিত বর্ণভিত্তিক বা জন্মভিত্তিক সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে স্থাণু সংখ্যাগরিষ্ঠতা বলে সমালোচনা করেছেন। নিম্নবর্ণ ও উচ্চবর্ণের সবাইকে নিয়ে সচল রাজনৈতিক সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রচলন করতে হবে, যেখানে বর্ণ অপেক্ষা রাজনৈতিক ভাবনা-চিন্তাই পরস্পরকে বেশী আকৃষ্ট করবে। এই ভাবে ভারতীয় গণতন্ত্র পুষ্ট হবে।

এই প্রসঙ্গে আম্বেদকর সম্পর্কে আর একটি কথা মনে আসে। তিনি ভাল করেই জানতেন যে নিম্নবর্ণভুক্তগণ শ্রমজীবী মানুষদের দরিদ্রতম অংশ। সুতরাং তিনি নিম্নবর্ণের উন্নতির উদ্দেশ্যে কাজ করবার সময়ে সমস্ত শ্রমজীবী মানুষদের উন্নতির কথাও বলতেন।

পরিশেষে বলা যায়, ভারতীয় সংবিধান রচনায় আম্বেদকরের নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা অপেক্ষা ভারতের জাতীয় কংগ্রেস দলের মতাদর্শই অধিক কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। তবুও সংবিধান পাঠ করলে কয়েকটি ক্ষেত্রে তাঁর সুস্পষ্ট অবদান প্রত্যক্ষ করা যায়। যাইহোক "সামাজতন্ত্রী, ধর্মনিরপেক্ষ, সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র" ভারত গড়ে তুলবার পেছনে তাঁর কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। সর্বোপরি, তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে যুগ যুগ ধরে অবহেলিত, নিগৃহীত, পদদলিত জনগোষ্ঠীর জন্য সংবিধান যে শিক্ষা, চাকরী, নির্বাচন সংক্রান্ত ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছে তার সুদুর প্রসারী কল্যাণময় প্রভাব আমরা প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ করছি। জওহরলাল নেহেরুর ভাষায়, "He was a symbol of revolt against all the oppressive features of Hindu Society." "সবার নীচে, সবার পিছে, সর্বহারাদের মাঝে" তিনি অবশ্যই চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

৪৩.৮ সারাংশ

অসাধারণ পন্ডিত, অতুলনীয় কর্মবীর ভীমরাও রামজী আম্বেদকরের (১৮৯১-১৯৫৬) কর্মজীবন প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পরিব্যাপ্ত ছিল। তাঁর জীবন বলিষ্ঠ আত্মবিশ্বাস, তীব্র জীবনসংগ্রাম ও পিছিয়ে পড়া মানুষের প্রতি গভীর দায়বদ্ধতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

আম্বেদকর অস্পৃশ্য মহার বর্ণভুক্ত ছিলেন। বাল্যকাল থেকেই নানারকম সামাজিক অসম্মানের শিকার হতে হতে অস্পৃশ্যদের ভাবী নেতার চরিত্র ইস্পাত-কঠিন রূপ ধারণ করতে থাকে। বরোদার মহারাজা ও কোলাপুরের মহারাজার পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইংল্যান্ডের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সর্বোচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। তিনি অসাধারণ মেধাবী ছাত্র ছিলেন। মূলতঃ তাঁর নেতৃত্বে আন্দোলনের ফলেই তিরিশের দশকে ব্রিটিশ সরকার সমস্ত নির্বাচিত রাজনৈতিক সংস্থায় নিম্নবর্ণের আসন সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু করে।

আম্বেদকর ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবার জন্য "Independent Labour Party" প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৪২-৪৬ সালে তিনি Viceroy's Executive Council -এ শ্রমমন্ত্রী হিসাবে কাজ করেছিলেন। সব সময়ই তিনি নিম্নবর্ণসহ সাধারণ শ্রমিক-কৃষকদের উন্নতিসাধনের লক্ষ্যে কাজ করেছেন। তিনি স্বাধীন ভারতের প্রথম শ্রমমন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছিলেন। সেই সাথে তাঁকে গণপরিষদের খসড়া কমিটির সভাপতির দায়িত্বও দেওয়া হয়। মূলতঃ তাঁরই অক্লান্ত প্রচেষ্টাতেই ভারতের সংবিধানে তফশিলী বর্ণের জন্য শিক্ষা, নির্বাচন, চাকরী ইত্যাদি ক্ষেত্রে সংরক্ষণের ব্যবস্থা হয়। তাঁকে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫২ সালে ভারতীয় সংবিধান রচনায় অসামান্য কৃতিত্বের জন্য সর্বোচ্চ ডিগ্রী "ডক্টর অফ ল" প্রদান করে। ১৯৫৬ সালের অক্টোবরে নাগপুরে তিনি কয়েক হাজার নিম্নবর্ণভুক্ত অনুগামীসহ বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। ১৯৫৬ সালের ৬ই ডিসেম্বর আম্বেদকর প্রয়াত হন।

আম্বেদকরের সামাজিক চিন্তাধারায় তিনি বর্ণব্যবস্থা ও অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে তাঁর সুচিন্তিত মতামত তীব্র ভাষায় প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে বর্ণব্যবস্থার উদ্দেশ্য হল, নিম্নবর্ণের উপর উচ্চবর্ণের আধিপত্য ও অত্যাচার বংশানুক্রমে কায়েম করে রাখা। তিনি হিন্দু ধর্মীয় শাস্ত্র, সমাজতত্ত্ব ও পুরাতত্ত্বের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন — হিন্দু পন্ডিতদের বর্ণব্যবস্থা, কুল, গোত্র, আর্য-অনার্য সম্পর্কিত যাবতীয় তত্ত্ব কোন ঐতিহাসিক সত্য নয়, মিথ্যাচার ও প্রতারণা মাত্র। পিছিয়ে পড়া মানুষদের সামাজিক সমস্যা ও দুঃখ-কষ্ট দূর করতে হলে প্রথমে প্রয়োজন তাদের উচ্চশিক্ষা, যা তাদের নিজেদের মানুষ হিসাবে ভাবতে শেখাবে।

আম্বেদকরের অর্থনৈতিক চিন্তাধারার মূল কথা ছিল, ব্রিটেনের শোষণ-নীতি নিম্নবর্ণের মানুষসহ সমগ্র কৃষক ও শ্রমিক সমাজকে দুর্দশা ও বঞ্চনার শেষ প্রান্তে পৌঁছে দিয়েছে। ওদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণীর জাতীয় নেতারা এদের আর্থিক সমস্যাকে একেবারেই প্রাধান্য দেন নি। ফলে বঞ্চিতদের সমস্যা আরও

গভীর ও জটিল হয়েছে। কৃষকদের উন্নতিকল্পে জমিদারী ও রায়তারী প্রথার বিরুদ্ধে এবং কৃষকদের জমির মালিকানা স্বত্ব স্বীকৃতির পক্ষে আম্বেদকর নানাবিধ আন্দোলন সংগঠিত করেন। সাধারণ-শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষায় কোন দল বা সংগঠনের আগ্রহ নেই, এইরকম মনোভাবের বশবর্তী হয়ে আম্বেদকর শ্রমিকদের মঙ্গলসাধনের উদ্দেশ্য নিয়েই "Independent Labour Party" নামে একটি শ্রমিক দল গঠন করেন। শিল্পের রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও পরিচালনা, শ্রমিক সমবায় ও শ্রমিকদের জন্য বিক্রয় বাজার গঠন, শ্রমিকদের স্বার্থে কর ব্যবস্থার সংস্কার, শ্রমিকদের জন্য বাধ্যতামূলক প্রয়োজনীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি কর্মসূচী তাঁর দল ঘোষণা করে।

আম্বেদকরের রাজনৈতিক চিন্তাধারা অনুসারে রাষ্ট্র ব্যক্তির জীবন, সুখ ও স্বাধীনতাকে রক্ষা করবে, ব্যক্তিকে দায়িত্ব সচেতন করবে এবং সামাজিক ও আর্থিক বৈষম্য দূর করবে। আম্বেদকর গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু তিনি জোরালোভাবে বলেছেন যে, রাজনৈতিক গণতন্ত্রকে সার্থক করতে হলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করতেই হবে। ভারতীয় সংবিধানের অন্যতম স্থপতি আম্বেদকরের সামাজিক-রাজনৈতিক চিন্তার প্রতিফলন সংবিধানের বিভিন্ন অংশে দেখা যায়; যথা, মৌলিক অধিকার, রাষ্ট্রপরিচালনায় নির্দেশমূলক নীতি, তফশিলী বর্ণভুক্তদের জন্য শিক্ষা, চাকরী, নির্বাচন সংক্রান্ত সংরক্ষণের ব্যবস্থা ইত্যাদি।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে আম্বেদকরের আবির্ভাবকে একটি "ঐতিহাসিক প্রয়োজন" ("historical necessity") হিসাবে দেখা যেতে পারে। ইংরাজরা নিম্নবর্ণের হিন্দুদের চরমভাবে শোষণ করছিল। ওদিকে উচ্চবর্ণের হিন্দুরাও নিম্নবর্ণের জন্য নিজেদের স্বার্থত্যাগ করতে রাজী ছিল না। তারা আন্দোলন করত তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক দাবি-দাওয়া নিয়ে। নিম্নবর্ণের সামাজিক-আর্থিক দুরবস্থার বিষয়টি তাদের আন্দোলনের বিষয় ছিল না। এই রকম অবস্থায় বঞ্চিতদের যন্ত্রণার অবসান ঘটাতে তাদেরই একজনকে নেতৃত্ব দিতে হবে, এই ঐতিহাসিক প্রয়োজনটি আম্বেদকরই মিটিয়ে ছিলেন।

আম্বেদকরের ছিল সংগ্রামী জীবন। তাই তাঁর পান্ডিত্যপূর্ণ সব রচনা একাডেমিক গবেষণার সীমায় আবদ্ধ না থেকে হয়ে উঠেছিল আন্দোলনের দাবিসনদ। যদিও ভারতে সংখ্যালঘু রাজনীতির মূলধারাটি আম্বেদকর প্রতিষ্ঠা করেছেন, তবুও তিনি বিচ্ছিন্নতাবাদকে কখনই সমর্থন করেন নি। তাঁর লক্ষ্য ছিল, সংখ্যালঘুদের নানাবিধ উন্নতি ঘটিয়ে তাঁদের জনজীবনের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনা।

নতুন সংবিধানে ভারতকে "সমাজতন্ত্রী, ধর্মনিরপেক্ষ, সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র" রূপে গড়ে তোলার পেছনে আম্বেদকরের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। কিন্তু লাঞ্ছিত অবহেলিতদের বন্ধু হিসাবে তাঁর কর্মকান্ড সম্ভবতঃ তাঁর জীবনের সবচেয়ে গৌরবোজ্বল দিক। ধূলায় যাঁদের আসন পাতা, তাঁদের মনে তাঁর জন্যে শ্রদ্ধার আসন চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে।

৪৩.৯ উৎস নির্দেশ

1. Dr. Ambedkar's speech on 1 September, 1951, cited in Eleanor Zelliot, "The Social and Political Thought of B.R. Ambedkar" in "Political Thought in Modern India", P. 173.

৪৩.১০ অনুশীলনী

বড় প্রশ্ন :

ক) আম্বেদকরের রাজনৈতিক চিন্তাধারা পর্যালোচনা করুন।

খ) রাজনৈতিক-সামাজিক নেতা হিসাবে আম্বেদকরের কার্যকলাপের সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

গ) আম্বেদকরের মতে রাষ্ট্রের লক্ষ্য কি ?

ঘ) আম্বেদকর "রাজনৈতিক সংখ্যাগরিষ্ঠতা" বলতে কি বুঝেছেন?

ঙ) দলিত সমাজের পারিস্থিতি সম্পর্কে আম্বেদকর রচিত দুটি বইয়ের নাম উল্লেখ করুন।

৪৩.১১ গ্রন্থপঞ্জী

1. Eleanor Zelliot : "The Social and Political Thought of B. R. Ambedkar" in "Political thought in Modern India", ed. Pantham and Deutsch (New Delhi, Beverly Hills etc. : Sage, 1986).

2. দেবাশিস চক্রবর্তী : "ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তার ধারা" (কলকাতা : সেন্ট্রাল বুক পাবলিশার্স, ১৯৯৭)

3. নীতিশ বিশ্বাস : "ড. বি. আর. আম্বেদকর" (কলকাতা : ঐকতান, ১৯৫৫)

4. মনোরঞ্জন বড়াল : "ড. ভীমরাও আম্বেদকর : কর্মজীবনের কয়েকটি দিক।" (কলকাতা : পথসংকেত প্রকাশনা, ১৯৯০)।

একক ৪৪ ☐ জয়প্রকাশ নারায়ণ

গঠন

৪৪.০ উদ্দেশ্য

৪৪.১ প্রস্তাবনা

৪৪.২ জয়প্রকাশের রাজনৈতিক মতাদর্শের (Political ideologies) বিবর্তন

৪৪.২.১ গান্ধীর ক্রমবর্ধমান প্রভাব

৪৪.৩ জয়প্রকাশ : জীবন ও কর্ম

৪৪.৩.১ মার্ক্সবাদ

৪৪.৩.২ গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র

৪৪.৩.৩ সর্বোদয় ভিত্তিক গণতন্ত্র

৪৪.৩.৪ সর্বাত্মক বিপ্লব

৪৪.৪ জয়প্রকাশ : ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রকৃত ধারক ও বাহক

৪৪.৫ সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন

৪৪.৬ সারাংশ

৪৪.৭ অনুশীলনী

৪৪.৮ গ্রন্থপঞ্জী

৪৪.০ উদ্দেশ্য

একক ৪৪ লেখা হয়েছে ভারতের সুবিখ্যাত রাজনৈতিক নেতা ও তাত্ত্বিক জয়প্রকাশ নারায়ণ সম্পর্কে। এই একক পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন :

- জয়প্রকাশ নারায়ণের গভীর রাজনৈতিক মূল্যবোধ ও অসামান্য দেশপ্রেমের কথা;
- তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারার বিবর্তনে গান্ধীর আশ্চর্য প্রভাবের কথা;
- তাঁর বর্ণাঢ্য ও রোমাঞ্চকর জীবন এবং সারাজীবনব্যাপী কর্মযজ্ঞের কাহিনী;
- মার্ক্সবাদ, গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র, সর্বোদয়-ভিত্তিক গণতন্ত্র ও সর্বাত্মক বিপ্লব সম্পর্কে তাঁর তত্ত্ব।
- একনায়কতন্ত্রের কবল থেকে ভারতীয় গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে তাঁর গৌরবদীপ্ত ভূমিকা;
- সুপ্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য ও দর্শনের ধারক-বাহক হিসাবে জয়প্রকাশের জীবন।

৪৪.১ প্রস্তাবনা

সাম্প্রতিককালে জয়প্রকাশ নারায়ণ ভারতীয় রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে আসেন ভারতীয় গণতন্ত্রের পরিত্রাতা হিসাবে তাঁর অনন্যসাধারণ ভূমিকার জন্য। ১৯৭৫ সালের ২৬শে জুন সমস্ত ভারতে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে ভারতীয় গণতন্ত্রকে প্রকৃতপক্ষে একনায়কতন্ত্রে পরিণত করা হয়। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও

জনগণের মৌলিক অধিকার বিনষ্ট করা হয়। বিরোধী দলের সব নেতা কারারুদ্ধ হন। সেই সময়ে অবিচার-অত্যাচারের বিরুদ্ধে জয়প্রকাশ সমস্ত জাতিকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং ১৯৭৭ সালের মার্চে লোকসভা নির্বাচনে স্বৈরাচারী সরকারের পরাজয় ঘটাতে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন।

কিন্তু শুধু জরুরী অবস্থার ভূমিকায় জন্যই নয়, দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে ভারতীয় রাজনীতিতে জয়প্রকাশ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রেখেছিলেন। তিনি একাধারে রাজনৈতিক নেতা ও তাত্ত্বিক ছিলেন। মননশীলতা ও নৈতিক চেতনার দিক থেকে জয়প্রকাশের সঙ্গে অধিকাংশ সমসাময়িক নেতার কোন তুলনাই চলে না। তিনি তাঁদের মত ক্ষমতালোভী ছিলেন না। জীবনে অনেকবার সুযোগ আসা সত্ত্বেও এই নির্লোভ, চরিত্রবান দেশপ্রেমিক নিজেকে সযত্নে ক্ষমতার কেন্দ্র থেকে দূরে সরিয়ে রাখতেন।

৪৪.২ জয়প্রকাশের রাজনৈতিক মতাদর্শের (political ideologies) বিবর্তন

জয়প্রকাশের রাজনৈতিক মতাদর্শস্থবির ছিল না, অভিজ্ঞতা ও অর্জিত জ্ঞানের ভিত্তিতে তার বিবর্তন ঘটে। তিনি প্রথম জীবনে মার্ক্সবাদে বিশ্বাস করতেন, তারপর তিনি একে একে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র, সর্বোদয়ভিত্তিক গণতন্ত্র ও সবশেষে সর্বাত্মক বিপ্লবে আস্থা প্রকাশ করেন।

চিন্তাবিদ হিসাবে জয়প্রকাশের অভিনবত্ব হল, কোন রাজনৈতিক মতাদর্শ (political ideologies) সম্পর্কে তাঁর কোন গোঁড়ামী ছিল না। তিনি নির্দিষ্ট কিছু রাজনৈতিক মূল্যবোধ (political values) বিশ্বাস করতেন— সেগুলি হল, স্বাধীনতা, সাম্য এবং ভ্রাতৃত্ব। তিনি এগুলিকে "আলোর নিশানা" ("beacons of light") আখ্যা দিয়ে বলেছেন, এই আলোর নিশানায় পৌঁছবার জন্য তিনি সারাজীবন পরিভ্রমণ করেছেন। কোন বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শ তাঁকে আলোর নিশানার দিকে এগিয়ে যেতে বাধা দিলে তিনি ঐ মতাদর্শ ত্যাগ করে নতুন মতাদর্শ গ্রহণ করবেন। এইভাবে একে একে চারটি মতাদর্শ তিনি পরিক্রমা করেছেন। রাজনৈতিক মূল্যবোধকে তিনি "লক্ষ্য" ("ends") এবং রাজনৈতিক মতাদর্শকে "মাধ্যম" ("means") আখ্যা দিয়েছেন। তাঁর কাছে মতাদর্শ হল মূল্যবোধের লক্ষ্যে পৌঁছবার মাধ্যম মাত্র।

এ যুগে রাজনৈতিক মতাদর্শ নিয়ে রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে বিবাদ-সংঘাত লেগেই থাকে। সেক্ষেত্রে মতাদর্শ নিয়ে জয়প্রকাশের মুক্তচিন্তা তাঁকে ব্যতিক্রমী চিন্তাবিদ হিসাবে চিহ্নিত করে। জয়প্রকাশকে বাস্তববাদী চিন্তাবিদও বলা যায়, কারণ বর্তমান জগতে সর্বক্ষেত্রে মতাদর্শের মিশ্রণ ঘটছে ; যেমন পুরো ধণতন্ত্রী বা পুরো সমাজতন্ত্রী আদর্শে বিশ্বাসী কোন রাষ্ট্রই বর্তমানে নেই।

এই প্রসঙ্গে বলা যায়, জয়প্রকাশ শুধু তাত্ত্বিক ছিলেন না, তিনি রাজনৈতিক নেতাও ছিলেন। জনগণের মঙ্গল সম্পর্কে তিনি সর্বদা সচেতন ছিলেন। নির্দিষ্ট মূল্যবোধগুলিকে, যথা, স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বকে লক্ষ্য হিসাবে সামনে রেখে তিনি মার্ক্সবাদকে বাস্তবে অনুসরণ করতে গিয়ে দেখলেন, এই তত্ত্বের কিছু অসম্পূর্ণতা আছে। এই অসম্পূর্ণতা দূর করতে গিয়ে তিনি পরবর্তী তত্ত্ব, গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রে পৌঁছন এবং তাকে অনুসরণ করতে থাকেন। একইভাবে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্তি পাবার জন্য

রচিত হল সর্বোদয়ভিত্তিক গণতন্ত্র। তাকে প্রয়োগ ধরতে গিয়ে যেসব অসুবিধা দেখা দিল সেগুলির প্রতিবিধান করবার জন্য রচনা করলেন সর্বাত্মক বিপ্লবের তত্ত্ব। সর্বদাই জয়প্রকাশের লক্ষ্য ছিল মূল্যবোধগুলিকে অর্জন করা।

সুতরাং আমরা দেখছি, (১) জয়প্রকাশ রাজনৈতিক মূল্যবোধগুলিকে লক্ষ্য রেখে রাজনৈতিক মতাদর্শকে সেই লক্ষ্যপূরনের পদ্ধতি হিসাবে দেখেছেন; (২) তিনি প্রতিটি তত্ত্বকে বাস্তবায়িত করতে চেয়েছেন। তিনি একইসাথে তাত্ত্বিক এবং কর্মী ছিলেন; (৩) বিভিন্ন তত্ত্ব নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করতে গিয়ে জয়প্রকাশ এক তত্ত্বের কিছু উপাদান অন্য তত্ত্বের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছেন (তাঁর রাজনৈতিক মূল্যবোধগুলি রূপায়ণের কথা মনে রেখে)। এইভাবে মার্ক্সবাদ যুক্ত হয়েছে গান্ধীর কিছু ধারণার সঙ্গে। গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রে তিনি সমাজতন্ত্রের সঙ্গে গান্ধীবাদের মিলন ঘটিয়েছেন। আবার সর্বাত্মক বিপ্লবে তিনি গান্ধীর সর্বোদয় ধারণার সঙ্গে কিছু মার্ক্সবাদী ধারণার সংযোজন ঘটিয়েছেন। এইভাবেই এগিয়েছে তাঁর মৌলিক, সৃজনশীল ভাবনা এবং সেই ভাবনার সূত্রে গড়ে উঠেছে তাঁর নিজস্ব তত্ত্ব।

৪৪.২.১ গান্ধীর ক্রমবর্ধমান প্রভাব

প্রথম থেকেই জয়প্রকাশের ওপর গান্ধীর প্রভাব ছিল। জয়প্রকাশের চিন্তাধারায় বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রভাব ক্রমেই স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। জয়প্রকাশের স্ত্রী প্রভাবতীদেবী গান্ধীর শিষ্যা ছিলেন। তিনি গান্ধী নির্দেশিত পথে আজীবন দেশসেবায় ব্রতী ছিলেন। বিভিন্ন কারণে জয়প্রকাশের উপর গান্ধীর প্রভাব পড়েছিল। স্ত্রী প্রভাবতীর মাধ্যমে জয়প্রকাশের উপর গান্ধীর প্রভাব এ রকম একটি কারণ হতে পারে।

জয়প্রকাশের প্রথম প্রচারিত মতবাদ মার্ক্সবাদে গান্ধীর কিছু ভাবনার পরিস্কার আভাস মেলে। তাঁর পরবর্তী মতবাদ গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রে তিনি সমাজতন্ত্রের সঙ্গে গান্ধীবাদের এক অভিনব সমন্বয় করেন। শেষ দুটি মতবাদ সর্বোদয়-ভিত্তিক গণতন্ত্র ও সর্বাত্মক বিপ্লবকে পুরোপুরি গান্ধীবাদই বলা চলে।

অনুশীলনী — ১

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

ক) ১৯৭৫ - ৭৭ সালে জয়প্রকাশ কোন্ ভূমিকার জন্য খ্যাতি অর্জন করেন?

খ) জয়প্রকাশ কি কি রাজনৈতিক মতাদর্শ রচনা করেছিলেন ?

গ) জয়প্রকাশ কোন্ কোন্ মূল্যবোধে বিশ্বাস করতেন?

ঘ) জয়প্রকাশের উপর গান্ধীর প্রভাবের বিষয়ে কি কোন ব্যক্তিগত সম্পর্কের ভূমিকা ছিল?

বড় প্রশ্ন :

ঙ) জয়প্রকাশের রাজনৈতিক মতাদর্শের বিবর্তন বিশ্লেষণ করুন।

৪৪.৩ জয়প্রকাশ : জীবন ও কর্ম :

জয়প্রকাশ নারায়ণের জীবন অকল্পনীয় সাহস, অতুলনীয় দেশপ্রেম এবং অসামান্য আত্মত্যাগের এক জ্বলন্ত উদাহরণ। রূপকথার রাজকুমারের মতই তাঁর এ্যাডভেঞ্চারময় জীবন। ১৯০২ সালের ১১ই অক্টোবর বিহারের (বর্তমানে উত্তরপ্রদেশের) সিতাব দিয়ারা গ্রামে এক নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে জয়প্রকাশ নারায়ণ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মায়ের সততা, স্নেহ ও সরলতা শৈশবাবস্থায় তাঁর চরিত্র গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষাগ্রহণ করে তিনি পাটনা কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হন এবং সেখান থেকে ১৯১৯ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। তারপর পাটনা কলেজে ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসে যোগ দেন। কিন্তু ১৯২১ সালে গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে সাড়া দিয়ে তিনি কলেজ পরিত্যাগ করেন।

অসহযোগ আন্দোলন সমাপ্ত হলে তিনি পাটনার একটি বেসরকারী কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেন। তারপর ১৯২২ সালে তাঁর স্ত্রী প্রভাবতী দেবীকে সবরমতী আশ্রমে গান্ধী ও তাঁর স্ত্রী কস্তুরবায় কাছে রেখে জয়প্রকাশ উচ্চশিক্ষার্থে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে যান।

আমেরিকাতে পড়াশোনা করবার সময় তিনি কারখানা, খেতখামার, হোটেল, নানা জায়গায় অত্যন্ত পরিশ্রম করে জীবিকার্জন করেন; আমেরিকায় অর্থনীতির উপর বিশ্বব্যাপী মন্দার করালছায়া প্রত্যক্ষ করেন এবং নিগ্রোদের উপর শ্বেতাঙ্গদের শোষণ ও অত্যাচার লক্ষ্য করেন। জয়প্রকাশ উইস্‌কন্‌সিন্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র থাকাকালীন কিছু বিদেশী মার্ক্সবাদী চিন্তাবিদের সংস্পর্শেও আসেন। এই পরিস্থিতিতে তিনি আমেরিকায় ছাত্রাবস্থায় মার্ক্সবাদে বিশ্বাস করতে শুরু করেন।

১৯২৯ সালে ওহাইও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সাথে বি. এ. ও এম.এ. পাশ করে জয়প্রকাশ ভারতে ফেরেন। মার্ক্সবাদে বিশ্বাসী জয়প্রকাশ ১৯৩৪ সালে নরেন্দ্র দেব, অশোক মেহতা, অচ্যুত পটবর্ধন প্রমুখ ব্যক্তিদের সঙ্গে নিয়ে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অভ্যন্তরেই "কংগ্রেস সমাজতান্ত্রিক দলের" সৃষ্টি করেন। ১৯৩৬ সালে তাঁর বিখ্যাত পুস্তক "Why Socialism ?" প্রকাশিত হয়।

কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে এবং যুদ্ধের সময়ে সোভিয়েত রাশিয়া ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির আচার-আচরণে জয়প্রকাশ ক্ষুব্ধ হন। মার্ক্সবাদে তাঁর আস্থা ক্ষুণ্ণ হয়। ১৯৪০ সালের মার্চে জামসেদপুরে তিনি ব্রিটিশ সরকারের যুদ্ধ-প্রচেষ্টার সঙ্গে সর্বপ্রকার অসহযোগিতা করবার আহ্বান জানিয়ে এক বৈপ্লবিক বক্তৃতা দেন।

এই কারণে তিনি গ্রেপ্তার ও কারারুদ্ধ হন। মুক্তি পাবার পর তাঁকে বিনা বিচারে রাজস্থানের দেওলী কারাগার ক্যাম্পে আটকে রাখা হয়। সেখানে তাঁর স্ত্রী প্রভবতী দেবী তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলে তিনি স্ত্রীর মাধ্যমে তাঁর সহকর্মীদের কাছে কিছু চিঠি পাচার করতে যান এবং ধরা পড়েন। ঐ চিঠিগুলিতে জয়প্রকাশ তাঁর সহকর্মীদের পরামর্শ দিয়েছিলেন— আত্মগোপন কর, অস্ত্রশস্ত্র ও অর্থসংগ্রহ কর এবং ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হও।

এরপর জয়প্রকাশকে হাজারীবাগের কেন্দ্রীয় কারাগারে আনা হয়। ১৯৪২ সালের ৮ই নভেম্বর দেওয়ালীর রাতে পাঁচজন সহবন্দীকে নিয়ে জয়প্রকাশ কারাগারের উচু পাঁচিল টপকে পালিয়ে যান। উত্তর বিহারের সীমান্ত সংলগ্ন নেপালের অরণ্যসঙ্কু তরাই অঞ্চলে তাঁরা আস্তানা পাতেন। সেখান থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উদ্দেশ্যে তিনি দুটি খোলা চিঠি লেখেন। ঐ দুটি চিঠিতে জয়প্রকাশ '৪২ এর ভারতছাড় আন্দোলনের সংগ্রামীদের হতাশাগ্রস্থ

না হতে অনুরোধ করেন। তিনি ব্রিটিশের বিরুদ্ধে অহিংস ও সশস্ত্র আন্দোলন দুয়েরই প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে দুরকম আন্দোলনই চালিয়ে যেতে আহ্বান করেন। তরাই অঞ্চলে জয়প্রকাশ " আজাদ দস্তা" নামে একটি গেরিলাবাহিনী সংগঠিত করেন। একদিন তিনি তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে যখন ঐ জঙ্গলে গেরিলা বাহিনীর সদস্যদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছিলেন তখন নেপালের পুলিশ তাঁদের গ্রেপ্তার করে থানায় বন্দি করে। কিন্তু রাতের অন্ধকারে গেরিলা যোদ্ধারা থানা আক্রমণ করে এবং দুপক্ষের অবিশ্রান্ত গুলি বিনিময়ের মধ্যে জয়প্রকাশ সঙ্গীদের নিয়ে পালিয়ে যান।

১৯৪৩ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর জয়প্রকাশকে দিল্লী ও রাওলপিন্ডি স্টেশনের মধ্যে একটি ট্রেন থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। তারপর লাহোর ফোর্টে জয়প্রকাশকে নির্জন ঘরে বন্দী রেখে তাঁর উপর অকথ্য অত্যাচার চালান হয়। ১৯৪৬ সালের এপ্রিলে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়।

১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারী গান্ধী হত্যার ঘটনায় জয়প্রকাশের চিন্তাধারায় একটা পরিবর্তন আসে। এই সময়ে তিনি গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র রচনা করতে গিয়ে গান্ধীবাদ দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হন। তিনি সমাজতন্ত্রের সাথে গান্ধীবাদের সমন্বয় ঘটাবার চেষ্টা করেন।

১৯৫২ সাল থেকে জয়প্রকাশ, বিনোবা ভাবের ভূদান আন্দোলনে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, হাজার হাজার গ্রামদানের ফলে সামাজিক ক্ষেত্রে গান্ধীবাদী অহিংস বিপ্লব ঘটানো সম্ভব হবে। এই ভাবে ভারতের কৃষিক্ষেত্রে ভূমিহীন চাষী ও ক্ষেত মজুরদের চরম দারিদ্র দূর করে সামাজিক সুস্থিতি ও মঙ্গলের লক্ষ্যে পৌছানো যাবে।

১৯৫৭ সালে জয়প্রকাশ "From Socialism to Sarvodaya" এবং ১৯৫৯ সালে "A Plea for Reconstruction of the Indian Polity" লেখেন। তিনি এই দুটি বইয়ে সমাজতন্ত্র ও সর্বোদয় উভয়েরই লক্ষ্য সাম্য বলে অভিমত প্রকাশ করেন। কিন্তু প্রথম ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ করতে হয়; দ্বিতীয় ক্ষেত্রেই স্বেচ্ছায় ত্যাগের মাধ্যমে সাম্য আনা সম্ভব। অহিংসাবাদী জয়প্রকাশের তাই সর্বোদয়ই বেশী পছন্দ ছিল।

কিন্তু ১৯৬৯ সাল থেকে জয়প্রকাশের মধ্যে অস্থিরতা প্রকাশ পেতে থাকে। তিনি নানারূপ সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অনাচারের বিরুদ্ধে এক অহিংস সামগ্রিক বিপ্লবের কথা ভাবতে থাকেন, যার নাম তিনি পরবর্তীকালে দিয়েছেন সর্বাত্মক বিপ্লব (Total Revolution)। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস বিভক্ত হবার পর ১৯৬৯ সাল থেকে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ধীরে ধীরে নিজের ক্ষমতা বাড়াতে থাকেন। জয়প্রকাশ সমস্ত ভারত ঘুরে জনগণকে হতাশা, বিষাদ ও ভয় থেকে মুক্ত হতে আহ্বান জানান। একই সঙ্গে তিনি সর্বব্যাপী দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করেন। তরুণ ও যুবসমাজের ওপর এর বিপুল প্রভাব পড়ে। ১৯৭৪ সালের ৫ই জুন পাটনায় গান্ধী ময়দানে এক মহতী জনসভায় তিনি সর্বাত্মক বিপ্লবের ডাক দিলেন। তিনি একই সাথে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, মতাদর্শগত, শিক্ষাগত ও আত্মিক বিপ্লবের আহ্বান জানালেন।

১৯৭৫ সালের ২৬ শে জুন মাঝরাতে প্রধানমন্ত্রী ইন্দ্রিরা গান্ধীর সুপারিশে রাষ্ট্রপতি সমস্ত ভারতে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন। জয়প্রকাশ সমেত সমস্ত বিরোধী নেতাদের কারারুদ্ধ করা হয়। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং জনগণের মৌলিক অধিকার স্থগিত করে দেওয়া হয়। কার্যতঃ ভারতীয় গণতন্ত্র অকস্মাৎ স্বৈরাচারী একনায়কতন্ত্রে পর্যবসিত হয়।

জয় প্রকাশের শারীরিক অবস্থার খুব অবনতি হওয়াতে তাঁকে কিছুদিন পরে মুক্তি দেওয়া হল। অসুস্থ

অবস্থায় জয়প্রকাশ গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে সমগ্র জাতিকে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এলেন। তিনি নিজে কোন রাজনৈতিক দলে যোগ না দিলেও কয়েকটি দলের মিলন ঘটিয়ে জনতা দল তৈরী করলেন। ১৯৭৭ সালের মার্চে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে জনতা দল লোকসভায় বিপুলভোটে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করল। মোরারজী দেশাই প্রধানমন্ত্রী হলেন এবং জরুরী অবস্থা প্রত্যাহৃত হয়ে ভারতে পুনরায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হল।

১৯৭৭ সালের ১৬ই জুলাই ভারতীয় বিদ্যাভবন জয়প্রকাশকে সংবর্ধনা জানিয়ে একটি "তাম্রপাত্র" প্রদান করে। ঐ "তাম্রপাত্রে" খোদিত ছিল, জয়প্রকাশ ভারতীয় গণতন্ত্রের পরিত্রাতা হিসাবে "১৯৭৭ সালের এক অভিনব ব্যালট-বাক্স বিপ্লবের সাহায্যে দেশীয় স্বৈরাচার থেকে" ভারতবাসীকে স্বাধীনতার রাজ্যে পৌঁছে দেন (As a messiah he led the Indians to freedom "from native dictatorship through a unique ballot-box revolution in 1977".)। বলা হয়, গান্ধী বিদেশী প্রভুর কবল থেকে ভারতের স্বাধীনতাকে পুনরুদ্ধার করেন; জয়প্রকাশ দেশী প্রভুর কবল থেকে ভারতের স্বাধীনতাকে পুনর্জীবিত করেন।

জয়প্রকাশ মোরারজী দেশাই সরকারের কার্যকলাপে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। কারণ দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলেও এই সরকার তাঁর সর্বাত্মক বিপ্লবের আদর্শ অনুসরণ করবার কোন আগ্রহই দেখাল না। জনগণের মঙ্গলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক-অর্থনৈতিক পদক্ষেপ নিতে এই সরকার ব্যর্থ হল। ১৯৭৯ সালের ৮ই অক্টোবর জয়প্রকাশের জীবনাবসান হয়।

ভারতমাতার সুসন্তান, আজীবন আত্মত্যাগী জয়প্রকাশ নারায়ণের আদর্শ ও স্বপ্ন হয়ত সফল হয় নি। কিন্তু মানুষের মর্যাদা, সাম্য, গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা অক্ষুন্ন থাকবে — এমন নতুন সমাজ গড়বার যে স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন তা যুগ যুগ ধরে মানুষকে অনুপ্রাণিত করবে।

৪৪.৩.১ মার্ক্সবাদ

আগেই বলা হয়েছে, জয়প্রকাশ রাজনৈতিক মতাদর্শকে রাজনৈতিক মূল্যবোধ অর্জনের পদ্ধতি হিসাবে দেখতেন। রাজনৈতিক মতাদর্শ নিয়ে এত গোঁড়ামী, এত সংঘাত চারিদিকে দেখা যায়, কিন্তু জয়প্রকাশের মন এই ক্ষেত্রে আশ্চর্য মুক্ত ছিল। তিনি তাঁর মূল্যবোধগুলি (স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব) রূপায়িত করার জন্য এক মতাদর্শ ত্যাগ করে শুধু অন্য মতাদর্শই গ্রহণ করতেন না, প্রয়োজনে মতাদর্শ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতেন। এক মতাদর্শের মধ্যে অন্য মতাদর্শের কিছু উপাদান গ্রহণ করতেন। এইভাবে জয়প্রকাশ মার্ক্সবাদের সঙ্গে গান্ধীর কিছু চিন্তাধারা ও উদারনৈতিক গণতন্ত্রের কিছু ভাবনার সম্মিলন ঘটিয়ে তাঁর নিজস্ব বৈপ্লবিক মতাদর্শ রচনা করেছিলেন।

জয়প্রকাশ ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত তাঁর "Why Socialism ?" গ্রন্থে মার্ক্সবাদের ব্যাখ্যা করেন। তিনি মার্ক্সবাদকে সামাজিক-অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের এক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। জয়প্রকাশ মার্ক্সবাদের মূলসূত্রগুলি গ্রহণ করেছিলেন, যেমন, প্রথমতঃ শ্রমের উদ্বৃত্ত মূল্যতত্ত্ব। শ্রমিক শ্রেণী ছাড়া অন্যকোন শ্রেণী সম্পদ সৃষ্টি করতে পারে না। কিন্তু তারা যে সম্পদ সৃষ্টি করে তার বাজার মূল্যের সামান্য অংশই তারা ভোগ করে। উদ্বৃত্ত মূল্য (যার পরিমাণ অনেক) ভোগ করে উৎপাদক নিজে, মালপত্তরের ব্যবসায়ী, ঋণদানকারী ব্যাংক ইত্যাদি। দ্বিতীয়তঃ শ্রেণী সংগ্রাম। মানুষের ইতিহাসই হল শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস। সমস্ত উৎপাদন ও মালিকানা যে শ্রেণীর হাতে থাকে সেই শ্রেণীই সম্পদহীন শ্রেণীকে শোষণ করে। রাষ্ট্র এই শোষক শ্রেণীর রক্ষকের কাজ করে। সাম্যবাদের মাধ্যমে যখন শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে তখন রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যাবে এবং রাষ্ট্র অবলুপ্ত হবে।

কিন্তু জয়প্রকাশ কট্টরপন্থী মার্ক্সবাদী ছিলেন না। তিনি "Why Socialism ?" গ্রন্থে মার্ক্সবাদ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উদারনৈতিক গণতন্ত্রের চিন্তাধারার স্বাক্ষরও রেখেছেন। যেমন, জয়প্রকাশ বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের পাশাপাশি নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের কথাও বলেছেন। সেই সঙ্গেই গান্ধীর চিন্তাধারার কথাও বলেছেন। ভারতের কৃষিক্ষেত্রে সোভিয়েত মডেল অনুযায়ী সমবায় ও যৌথ খামার ব্যবস্থার (co-operative and collective farming) সুপারিশ করার সাথে সাথে জয়প্রকাশ গান্ধীকে অনুসরণ করে বলেছেন, কৃষিক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে। বলপ্রয়োগ পরিহার করতে হবে এবং অতিদ্রুত আধুনিক যন্ত্রপাতি প্রবর্তন করা চলবে না।

৪৪.৩.২ গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র

আগেই বলা হয়েছে, জয়প্রকাশের রাজনৈতিক চিন্তাধারার ক্রমবিবর্তনে তিনি ক্রমেই গান্ধীর দিকে চলে এসেছেন। তাঁর প্রথম রাজনৈতিক মতবাদ মার্ক্সবাদে তিনি গান্ধীর কিছু ধারণা নিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর পরবর্তী মতবাদ গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রে তিনি সমাজতন্ত্রের সঙ্গে গান্ধীবাদের এক অভিনব মিল ঘটিয়েছিলেন। বস্তুতঃ জয়প্রকাশের এই মতবাদের নামকরণ হওয়া উচিত গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র নয়, গান্ধীবাদী সমাজতন্ত্র

জয়প্রকাশ মনে করতেন, সমাজতন্ত্রের সঙ্গে গান্ধীবাদের মিলন ঘটানো সম্ভব, কারণ উভয় মতবাদই একই ধরণের মূল্যবোধকে (valucs) বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করে। এগুলি হল সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্য, শোষণের হাত থেকে মুক্তি আত্মবিকাশের স্বাধীনতা এবং সমাজ ও ব্যক্তির পারস্পরিক দায়বদ্ধতা ইত্যাদি। কোন কোন ক্ষেত্রে জয়প্রকাশ এই দুটি মতাদর্শের মিলন ঘটিয়েছিলেন তা এখন আলোচনা করা যেতে পারে।

প্রথমতঃ জয়প্রকাশের মতে যথার্থ সমাজতন্ত্র মানুষের বৈষয়িক উন্নতির চেষ্টা করে। কিন্তু সেই সঙ্গে গান্ধীকে অনুসরণ করে মানুষের নৈতিক উন্নতির কথাও ভাবা দরকার। তাঁর মতে সমাজতন্ত্রে যদি জীবনের প্রতিটি দিকের পরিকল্পনা করা হয়, তবে নৈতিক উন্নতি নিয়েও পরিকল্পনা করতে হবে। বিষয়টি ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দেওয়া যুক্তিযুক্ত হবে না।

দ্বিতীয়তঃ সমাজতন্ত্রের ধারণানুযায়ী "উদ্দেশ্যই উপায়ের যাথার্থ্য" ("End justifies means")। অর্থাৎ উদ্দেশ্য সঠিক হলে উদ্দেশ্য পূরণের পথ বা উপায়ের ভাল-মন্দ বিচার করার কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু জয়প্রকাশ মনে করতেন, গান্ধী সঠিকভাবেই বলেছেন, কোন মন্দ পথ বা উপায় অনুসরণ করে কখনও কোন ভাল উদ্দেশ্য পূরণ করা সম্ভব নয়। উদাহরণ হিসাবে জয়প্রকাশ বলেছেন, সোভিয়েত রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র গঠনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হল, কারণ পদ্ধতি বা উপায়ের ন্যায়-অন্যায় বিচার করা হয় নি। অতএব সমাজতন্ত্রের ভাবনায় উদ্দেশ্য বা উপায়ের গুরুত্বকে স্বীকার করা দরকার।

তৃতীয়তঃ জয়প্রকাশ মনে করতেন, রাষ্ট্রের সাহায্য নিয়ে সমাজতন্ত্র গঠনের প্রচেষ্টা কখনই সার্থক হতে পারে না। তিনি সামাজিক পরিবর্তনের গান্ধীবাদী পদ্ধতির স্বপক্ষে ছিলেন। এই পদ্ধতির মধ্যে গঠনমূলক ও প্রতিরোধমূলক উভয় ধরণের কার্যকলাপ থাকবে। শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র —সমাজের সর্বস্তরের লোকদের সংগঠিত করে তাদের চেতনা ও শিক্ষার মান উন্নত করতে হবে। এই কাজ গঠনমূলক। সাথে সাথে অহিংস প্রতিরোধ করতে হবে অসাম্য, অবিচারের বিরুদ্ধে। সমাজতন্ত্র গঠন করতে হলে নতুন পরিবেশ, নতুন মানুষ, নতুন মূল্যবোধ সৃষ্টির প্রয়োজন। এইভাবে জয়প্রকাশ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় "গান্ধীবাদী বৈপ্লবিক পদ্ধতির" প্রয়োজনের কথা বলেছেন।

চতুর্থতঃ জয়প্রকাশ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কেন্দ্রীকরণ চরম ক্ষতিকারক বলে মনে করেন। তিনি সোভিয়েত রাশিয়ার দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছেন। সেখানে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এক সুবিধাভোগী পরিচালক শ্রেণী (managerial class) সৃষ্টি হয়েছিল যারা সাম্যের আদর্শকে বানচাল করে দিয়েছিল। রাজনৈতিক কেন্দ্রীকরণের ফলস্বরূপ স্বৈরাচারী একনায়কতন্ত্র দেখা দিল। এই কেন্দ্রীকরণ সমস্যা ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক উৎস রাষ্ট্রেরই বিশাল সমস্যা। গান্ধীবাদী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণই সমাজতন্ত্র গঠনে প্রকৃত সাহায্য করবে।

যাইহোক্, জয়প্রকাশ মন্তব্য করেছেন, সমাজতন্ত্রের সঙ্গে গান্ধীবাদ যুক্ত হলে সমাজতন্ত্রের দোষ-ত্রুটি গান্ধীবাদ শোধন করতে পারবে।

অনুশীলনী — ২

বড় প্রশ্ন :

ক) জয়প্রকাশের কর্ম ও জীবন সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

খ) জয়প্রকাশ প্রচারিত মার্ক্সবাদ পর্যালোচনা করুন।

গ) জয়প্রকাশ প্রচারিত গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের উপর একটি টীকা লিখুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

ঘ) জয়প্রকাশ প্রচারিত মার্ক্সবাদে অন্যান্য কোন্ কোন্ মতাদর্শের সন্ধান পাওয়া যায় ?

ঙ) জয়প্রকাশ রচিত গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের সঠিকভাবে কি নামকরণ হওয়া উচিত ছিল ?

৪৪.৩.৩ সর্বোদয় ভিত্তিক গণতন্ত্র

"সর্বোদয়" শব্দের অর্থ হল সবার মঙ্গল। জয়প্রকাশ কালক্রমে সমাজতন্ত্রের বাস্তবমূল্য সম্পর্কে আস্থা হারিয়ে 'সর্বোদয়' প্রচারে আগ্রহী হয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, জীবন সম্পর্কে বৈষয়িক দৃষ্টিভঙ্গী মানুষকে ধন-সম্পদ সম্পর্কে অতিরিক্ত লোভী করে তুলেছে এবং ব্যক্তি, গোষ্ঠী এবং জাতি — সবার পারস্পরিক দ্বন্দ্ব বাড়িয়ে তুলেছে। এই পরিস্থিতিতে সাম্য ও স্বাধীনতার আদর্শ রূপায়িত করা খুবই কঠিন কাজ। রাষ্ট্র বলপ্রয়োগ দ্বারা এই উদ্দেশ্য সাধন করতে গেলে সফল হবার সম্ভাবনা নেই। কমিউনিস্ট দেশগুলির অভিজ্ঞতা থেকেই তা বোঝা যায়।

জয়প্রকাশের মতে, এই পরিস্থিতিতে সমাজতন্ত্রের আদর্শ অর্থাৎ সাম্য ও স্বাধীনতা অর্জন করা সম্ভব সর্বোদয়-ভিত্তিক গণতন্ত্রে। এই সহজ সরল গণতন্ত্রে নতুন মূল্যবোধ কাজ করবে — ব্যক্তি নির্লোভ হবে, অপরের জন্য ত্যাগ স্বীকারে রাজী থাকবে। ব্যক্তি হৃদয়ঙ্গম করবে তার নিজের মঙ্গল নিহিত আছে "সর্বোদয়" অর্থাৎ সবার মঙ্গলের মধ্যে। পারস্পরিক বোঝাপড়া, ভালবাসা ও আত্মত্যাগের ভিত্তিতেই জনগণ সাম্য ও স্বাধীনতার আদর্শকে স্বেচ্ছায় রূপায়িত করবে — সমাজতন্ত্রীদের ধারণানুযায়ী রাষ্ট্রের বলপ্রয়োগের দরকার হবে না।

এই রকম নতুন মূল্যবোধ, নতুন মানুষ ও সহজ সরল জীবন রচনা করার জন্য সর্বোদয়-ভিত্তিক গণতন্ত্রে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ হবে। সরকারের গঠনব্যবস্থা এমন হবে যে গ্রামস্তর থেকেই সরকারী ক্ষমতা ছড়িয়ে দেওয়া হবে। গ্রামস্তরে থাকবে গ্রাম পঞ্চায়েত যারা গ্রামের জনগণের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, প্রাথমিক শিক্ষা ও প্রাথমিক চিকিৎসার দায়িত্ব পাবে। গ্রাম পঞ্চায়েতকে নির্বাচন করবে গ্রামের জনগণ।

কয়েকটি গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচন করবে একটি পঞ্চায়েত সমিতিকে যারা অঞ্চলের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। কয়েকটি পঞ্চায়েত সমিতি নির্বাচন করবে একটি জিলা পরিষদকে যারা জিলার শাসনব্যবস্থার দায়িত্ব নেবে। এইভাবে জিলা পরিষদ নির্বাচন করবে প্রাদেশিক সভাকে এবং প্রাদেশিক সভা নির্বাচন করবে জাতীয় সভাকে। এই জাতীয় সভার হাতে থাকবে দেশরক্ষা, মুদ্রাব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, ইত্যাদি। লক্ষ্যণীয়, জয়প্রকাশের গণতন্ত্রে কোন রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব থাকবে না।

একইভাবে জয়প্রকাশ সর্বোদয়ী গণতন্ত্রে অর্থনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণের কথা বলেছেন। সমাজের মূল উদ্দেশ্য হবে, সবার প্রাথমিক প্রয়োজনগুলি মেটানো, যেমন, খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, চাকরী ইত্যাদি। সেইজন্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনা শুরু হবে নীচু থেকে। গ্রামের আয়তন ছোট বলে কয়েকটি গ্রাম নিয়ে গঠিত একটি অঞ্চলকে ভিত্তি করেই পরিকল্পনা গড়ে উঠবে।

স্বাভাবিকভাবেই এইরকম অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ক্ষুদ্রশিল্পের উপরই বেশী নির্ভর করা হবে। ক্ষুদ্রশিল্প যথেষ্ট পরিমাণ চাকরীর সুযোগ সৃষ্টি করবে এবং সম্পদের ব্যাপক বন্টন করবে। সেই সঙ্গে স্থানীয় চাহিদা মেটাবার জন্য স্থানীয় প্রাকৃতিক ও মানবীয় সম্পদেরও পুরো সদ্ব্যবহার করবে।

জয়প্রকাশ মন্তব্য করেছেন, সর্বোদয়ী গণতন্ত্রকে সফল করতে হলে "সমাজ চেতনা" ("Spirit of Community") সৃষ্টি করতে হবে এবং "দৃষ্টান্ত, সেবা, ত্যাগ ও ভালবাসার সাহায্যে নৈতিক পুনরুজ্জীবনের এই কাজ সুসম্পন্ন করতে হবে" (a task of moral regeneration to be brought about by example, service, sacrifice and love."[2]).

জয়প্রকাশ মনে করতেন, এই যুগে ব্যক্তির স্বাধীনতা, সাম্য, এমন কি তার অস্তিত্বও বিপন্ন হয়েছে বৃহৎ রাষ্ট্র ও বৃহৎ অর্থনৈতিক সংগঠনের চাপে। উদারনৈতিক গণতন্ত্রে বিশাল রাষ্ট্র রয়েছে। ব্যক্তি নির্বাচনে হয়ত তার একটি ভোট দেয় — কিন্তু সমগ্র রাজনৈতিক পদ্ধতিতে এককভাবে তার তেমন কোনও ভূমিকা থাকে না। একইভাবে, বৃহৎশিল্প, একচেটিয়া পুঁজিব্যবস্থাও ব্যক্তির কর্মজীবনে নিঃসঙ্গতা ও অসহায়তা বোধ নিয়ে আসে। সর্বোদয় ব্যবস্থা এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তির ভূমিকাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়, তাকে যথেষ্ট দায়িত্ব ও কর্তব্য প্রদান করে। "প্রকৃত স্ব-শাসন" ("real self-government") - এর স্বাদ ব্যক্তি অনুভব করে। সুতরাং সমাজতন্ত্রের আদর্শ — সাম্য ও স্বাধীনতা অর্জন — একমাত্র এই সমাজেই রূপায়ন করা সম্ভব।

৪৪.৩.৪ সর্বাত্মক বিপ্লব

সর্বোদয়ের পর জয়প্রকাশের চিন্তাধারার বিবর্তন তাঁকে তাঁর সর্বাত্মক বিপ্লব তত্ত্বে পৌঁছে দেয়। ৪৪.৩ অংশে জয়প্রকাশের জীবন ও কর্ম আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখেছি, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নানারকম অবিচার-অত্যাচার দীর্ঘকাল প্রত্যক্ষ করার পর ১৯৬৯ সাল থেকে জয়প্রকাশের মধ্যে একজাতীয় অস্থিরতা দেখা দিল। ১৯৬৯ সাল থেকে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ধীরে ধীরে স্বৈরাচারী শাসক হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে শুরু করেন। সর্বোদয় মতাদর্শে বিশ্বাসী জয়প্রকাশের মনে হতে লাগল আবেদন — অনুরোধ দ্বারা তাঁর নতুন সমাজ গড়বার কাজ সফল হবে না। প্রয়োজন ব্যাপক গণ-আন্দোলন — অবশ্যই শান্তিপূর্ণ গান্ধীবাদী পদ্ধতি অনুসরণ করে।

আমরা ৪৪.৩ অংশে আরও দেখেছি শেষ পর্যন্ত ১৯৭৪ সালের ৫ই জুন পাটনায় গান্ধী ময়দানে এক

বিশাল জনসভায় তিনি জীবনের সব ক্ষেত্রে এক সর্বাত্মক বিপ্লবের ডাক দিলেন। একই সাথে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, মতাদর্শগত, শিক্ষাগত ও আত্মিক বিপ্লবের আহ্বান জানালেন। এই সর্বাত্মক বিপ্লবের সামগ্রিকভাবে সফল পরিণতি না হলেও একাংশে সার্থক হয়েছিল বলা যায়। ১৯৭৭ সালের মার্চে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী নির্বাচনে পরাজিত হলেন। জনতা দলের নতুন সরকার গঠিত হ'ল। জরুরী অবস্থা ও স্বৈরাচারী শাসন বাতিল করে ভারতে গণতন্ত্রকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা গেল।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে সর্বোদয় ও সর্বাত্মক বিপ্লবের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য সম্বন্ধে। Geoffrey Ostergaard মন্তব্য করেছেন, লক্ষ্যের দিক থেকে উভয়ের সাদৃশ্য আছে, কিন্তু পার্থক্য রয়েছে কৌশলের (Strategies) দিক থেকে। এই মন্তব্যকে ব্যাখ্যা করে বলা যায়, প্রথমতঃ উভয়েই রাষ্ট্রের মাধ্যমে নয়, জনগণের সচেতনতা ও স্বতঃস্ফূর্ত ইচ্ছার মাধ্যমে লক্ষ্যে পৌঁছাতে চায়। দ্বিতীয়তঃ উভয়ই সামাজিক জীবনের সব দিকেরই পরিবর্তন চায়। তৃতীয়তঃ উভয়েই গান্ধীবাদী পঞ্চায়েত শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন চায়। কিন্তু কৌশলের দিক থেকে পার্থক্য রয়েছে। সর্বোদয়ী মানুষের বিবেকের কাছে আবেদন-নিবেদন করতে চান—হৃদয়ের পরিবর্তনের জন্য অপেক্ষা করেন। কিন্তু সর্বাত্মক বিপ্লবী অহিংস হলেও বিপ্লবেরই পরিকল্পনা করেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে গান্ধী যেসব ব্যাপক সত্যাগ্রহ ও আইন অমান্য আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন সেই জাতীয় আন্দোলন করতে সর্বাত্মক বিপ্লবী রাজী থাকেন।

এই প্রসঙ্গে প্রখ্যাত বামপন্থী রাজনৈতিক নেতা ও তাত্ত্বিক ই. এম. এস. নাম্বুদিরিপাদের মন্তব্যের উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর স্বৈরাচারী শাসনের অবসানের জন্য জয়প্রকাশের আহ্বানে সমস্ত ভারতব্যাপী যে গণ আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছিল তা নিঃসন্দেহে গান্ধী-পরিচালিত আইন অমান্য এবং সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সঙ্গে তুলনীয়।

সবশেষে বলা যায়, জয়প্রকাশের সর্বাত্মক বিপ্লব প্রথাগত বিপ্লবের (traditional revolution) মত সরকারের পরিবর্তন কেই একমাত্র লক্ষ্যবস্তু করে না — নতুন রাজনীতি ও নতুন মূল্যব্যবস্থা (a new polities and a new value-system) রচনা করতে চায়। এই মূল্য-ব্যবস্থায় ক্ষমতাকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না, গুরুত্ব দেওয়া হয় পারস্পরিক বিশ্বাস, আত্মসম্মান ও যৌথ প্রচেষ্টাকে। এ কথাও বলা যায়, সর্বাত্মক বিপ্লবের উদ্দেশ্য হল, ভারতীয় জনগণের নৈতিক পুনরুজ্জীবন। ১৯৪৮ সালে গান্ধী-হত্যার পরবর্তী সময়ে ধীরে ধীরে ভারতের রাজনীতির ও সমাজের নৈতিক চরিত্র ক্রমশঃ বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। ১৯৭০ -এর দশকে জয়প্রকাশ ঘোষিত সর্বাত্মক বিপ্লব বা নতুন মূল্য-ব্যবস্থা রচনার বিপ্লব দেশের রাজনীতিতে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছিল।

৪৪.৪ জয়প্রকাশ : ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রকৃত ধারক ও বাহক

Dennis Dalton -এর মতে, জয়প্রকাশ নারায়ণকে বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী বিরচিত ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রকৃত উত্তরাধিকারী বলা চলে। কারণ — প্রথমতঃ এই সব চিন্তাবিদদের মতই জয়প্রকাশ বৃহৎ রাষ্ট্রের প্রতি বিরাগ পোষণ করতেন। তাঁর সর্বোদয়ী গণতন্ত্রের ধারণা পঞ্চায়েত ও আঞ্চলিক সমিতি স্তরে। ক্ষমতা ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিল।

দ্বিতীয়তঃ এই সব চিন্তাবিদদের অনুসরণে তিনি সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য স্বীকার করেছিলেন। তাদের মতই তিনি সামাজিক পরিবর্তনের জন্য নির্ভর করেছিলেন জনগণের শক্তি ওপর, রাষ্ট্রের শক্তির ওপর

নয়। জনগণের শক্তি যাতে সত্যিই কার্যকর হতে পারে সেজন্য তিনি সর্বোদয়ী গণতন্ত্রের কাঠামো রচনা করেছিলেন।

তৃতীয়তঃ জয়প্রকাশের দর্শনের নৈতিক প্রকৃতি ঐ চিন্তাবিদদের সাথে তাঁর সাদৃশ্য স্পষ্ট করে তুলেছে। বিবেকানন্দ মন্তব্য করেছেন, সমস্ত রকমের শাসনব্যবস্থার কার্যকারিতা নির্ভর করে "মানুষের ভালত্বের" ("goodness of man") উপর। অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীও ব্যক্তির "নৈতিক ও আত্মিক উন্নতি" ("moral and spiritual uplift") চাইতেন। জয়প্রকাশও একই সুরে কথা বলেছেন, তাঁর আদর্শ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র এমন এক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক গণতন্ত্র হবে যেখানে মানুষের পরিপূর্ণ নৈতিক উন্নতির সুযোগ থাকবে। অতএব জয়প্রকাশ নিঃসন্দেহে বিবেকানন্দ প্রমুখ মহামানবগণের বিরচিত ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রকৃত ধারক ও বাহক ছিলেন।

৪৪.৫ সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন

ভারতের রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে জয়প্রকাশ নারায়ণের মত নির্লোভ, সর্বস্বত্যাগী নেতা খুবই বিরল। জীবনে অনেকবার উঁচু সরকারী পদগ্রহণের প্রস্তাব পেয়েছেন; এমন কি ভারতের প্রধানমন্ত্রী হবার সুযোগও পেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি সর্বদা সযত্নে নিজেকে ক্ষমতার কেন্দ্র থেকে দূরে সরিয়ে রাখতেন। নির্লোভ, নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমের এক গৌরবোজ্বল দৃষ্টান্ত ছিলেন জয়প্রকাশ।

তিনি জীবনে বারবার দেশপ্রেমের তাগিদে দুরন্ত সাহসের পরিচয় দিয়েছেন। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে বসে তিনি দেশসেবার অভিনয় করতেন না। তিনি রাজস্থানের দেওলী কারাগার ক্যাম্পে বসে সহকর্মীদের উদ্দেশ্যে সশস্ত্র সংগ্রামের আহ্বান জানিয়ে চিঠি লেখেন এবং সেই চিঠি তাঁর স্ত্রীর মাধ্যমে বাইরে পাচারের চেষ্টা করেন। দেওয়ালীর রাতে হাজারীবাগ জেলের উঁচু পাঁচিল বেয়ে উঠে পালিয়ে যান, দুর্গম তরাই অঞ্চলে "আজাদ দস্তা" নামে গেরিলাবাহিনী তৈরী করেন। আবার নেপালী পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করলে অবিশ্রান্ত গুলিবৃষ্টির মধ্যেই সাথী গেরিলাদের সাহায্যে পালিয়ে যান। পরবর্তীকালে ১৯৭৫-৭৭ সালের জরুরী অবস্থার সময়ে বৃদ্ধ জয়প্রকাশ দুরারোগ্য কিডনীর অসুখে আক্রান্ত হয়ে অত্যন্ত অসুস্থ অবস্থায় যেভাবে স্বৈরাচারের বিরূদ্ধে সমগ্র জাতিকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাকে শৌর্যবীর্য ও দেশপ্রেমের চরম দৃষ্টান্ত বলা যেতে পারে।

রাজনীতিজ্ঞদের মধ্যে মতাদর্শ (ideology) সম্পর্কে সাধারণতঃ গোঁড়ামী থাকে। জয়প্রকাশের অভিনবত্ব হল, তাঁর মধ্যে বিন্দুমাত্র গোঁড়ামি ছিল না। তিনি নির্দিষ্ট কিছু রাজনৈতিক মূল্যবোধে (Political values) বিশ্বাস করতেন । যেমন, স্বাধীনতা, সাম্য এবং ভ্রাতৃত্ব। এগুলিকে "আলোর নিশানা" ("beacons of light") বলে অভিহিত করে এদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে একের পর এক মতাদর্শ পাল্টে এক মতাদর্শের সঙ্গে অন্য মতাদর্শের মিলন ঘটিয়ে তিনি এগিয়ে যেতেন। কিন্তু তাই বলে জয়প্রকাশ সুবিধাবাদী আপোষপন্থী আদৌ ছিলেন না। জীবনের প্রথম থেকে শেষ অবধি নানারকম পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েও তিনি নির্দিষ্ট মূল্যবোধে কখনও আস্থা হারান নি। এইভাবে রাজনৈতিক মতাদর্শের ক্ষেত্রে যথেষ্ট উদারতা, নমনীয়তা ও সৃজনশীলতার পাশাপাশি তাঁর চরিত্রের বিশাল উদারতা ও অসাধারণ দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া যায়।

জয়প্রকাশ বাস্তবসম্পর্কহীন পন্ডিত বা তাত্ত্বিক ছিলেন না। তিনি একাধারে রাজনৈতিক তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক নেতা ছিলেন। কোন তত্ত্ব রচনা করে তিনি বাস্তবক্ষেত্রে সেটি প্রয়োগ করতেন; বাস্তব প্রয়োগে সেই তত্ত্বের যে সব ত্রুটি ধরা পড়ত সেগুলি সংশোধন করে নিয়ে আবার নতুন তত্ত্ব রচনা করে বাস্তবে প্রয়োগ

করতেন। উদাহরণস্বরূপ, জয়প্রকাশ মার্ক্সবাদ বাস্তবে প্রয়োগ করে তার ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করে পরিবর্তী মতবাদ "গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র" রচনা করলেন। এইভাবে তত্ত্ব ও বাস্তবের ধারাবাহিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা জয়প্রকাশের কর্মকান্ডের আর এক অভিনব বৈশিষ্ট্য বলা যেতে পারে।

এইভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতেন বলে তাঁর তত্ত্বের এক বিশেষ বাস্তবমূল্যও রয়েছে। এই প্রসঙ্গে বলা যায়, তাঁর রচিত তত্ত্বগুলির সামগ্রিক মূল্যায়ন করে বিশেষজ্ঞগণ এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হয়েছেন যে তিনি আধুনিক ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক তাত্ত্বিক (political theorist) ছিলেন। এই সিদ্ধান্তের সারবত্তা নিয়ে কোনও সংশয় বা দ্বিধার সুযোগই নেই।

১৯৭৫-৭৭ সালে জরুরী অবস্থা চলাকালীন ভারতীয় গণতন্ত্র পুরোপুরি একনায়কতন্ত্রে পরিণত হয়েছিল। সেই পরিস্থিতিতে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে জয়প্রকাশ সমগ্র জাতিকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। বলা হয়, গান্ধী বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীর কবল থেকে ভারতের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করেছিলেন; জয়প্রকাশ দেশীয় স্বৈরাচারীর করাল গ্রাস থেকে ভারতের স্বাধীনতা পুনর্জীবিত করেছিলেন।

সবশেষে এই আত্মত্যাগী মহান দেশপ্রেমিককে প্রণাম জানিয়ে কবিগুরুর কথায় তাঁর উদ্দেশ্যে বলি—

"কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আস

সাধক ওগো, প্রেমিক ওগো,

পাগল ওগো, ধরায় আস।।"

৪৪.৬ সারাংশ

দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে ভারতীয় রাজনীতিতে জয়প্রকাশ নারায়ণ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রেখেছিলেন। একাধারে রাজনৈতিক তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক নেতা, জয়প্রকাশ ছিলেন এক বিরল আত্মত্যাগী ও নির্লোভ দেশপ্রেমিক। তিনি নির্দিষ্ট কিছু মূল্যবোধে (স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব) বিশ্বাসী ছিলেন এবং সেই মূল্যবোধগুলিকে অর্জন করবার জন্য তিনি বারে বারে তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শকে পরিবর্তন করেছেন নির্দ্বিধায় এবং আশ্চর্য সাহসের সঙ্গে।

জয়প্রকাশের জীবনে ও চিন্তাধারায় গান্ধীর ক্রমবর্ধমান প্রভাব দেখা যায়। জয়প্রকাশের প্রচারিত শেষ দুটি মতবাদকে (সর্বোদয়-ভিত্তিক গণতন্ত্র ও সর্বাত্মক বিপ্লব) পুরোপুরি গান্ধীবাদই বলা চলে। তাঁর ৭৭ বছরের দীর্ঘ জীবন বস্তুতঃ শৌর্যবীর্য, আত্মত্যাগ ও সাংগঠনিক প্রতিভার এক অপূর্ব নিদর্শন।

তাঁর প্রচারিত প্রথম মতবাদ মার্ক্সবাদ কট্টরপন্থী মার্ক্সবাদ ছিল না। তাঁর মার্ক্সবাদী চিন্তাধারায় উদারনৈতিক গণতন্ত্র ও গান্ধীর চিন্তাধারায় পরিস্কার ছাপ পাওয়া যায়। পরবর্তী মতবাদ গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রে তিনি সমাজতন্ত্রের সঙ্গে গান্ধীবাদের এক অভিনব মিলন ঘটিয়েছিলেন। তাঁর মতে সমাজতন্ত্র মানুষের বৈষয়িক উন্নতির চেষ্টা করে। গান্ধীবাদ মানুষের নৈতিক উন্নতির চেষ্টা করে। উভয়ের মিলন ঘটলে মানুষের সামগ্রিক উন্নতি সম্ভব। সর্বোদয়ী গণতন্ত্রে জনগণ স্বেচ্ছায় সমাজতন্ত্রের আদর্শকে — সাম্য ও স্বাধীনতাকে — পারস্পরিক বোঝাপড়া, ভালবাসা ও আত্মত্যাগের ভিত্তিতে বাস্তবায়িত করবেন। পরবর্তী চিন্তাধারা সর্বাত্মক বিপ্লব লক্ষ্যের দিক থেকে সর্বোদয় চিন্তাধারার সঙ্গে অভিন্ন। কিন্তু কৌশলের (Strategies) দিক থেকে তাদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। সর্বোদয়ী

মানুষের বিবেকের কাছে আবেদন-নিবেদন করেন— হৃদয়ের পরিবর্তনের জন্য অপেক্ষা করেন। কিন্তু সর্বাত্মক বিপ্লবী অহিংস বিপ্লব ও সত্যাগ্রহের আয়োজন করেন।

জয়প্রকাশ নারায়ণকে বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী বিরচিত ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রকৃত ধারক ও বাহক বলা চলে। জয়প্রকাশের রচিত তত্ত্বগুলির কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও এই সিদ্ধান্তে নিঃসন্দেহে আসা যায় যে তিনি আধুনিক ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক তাত্ত্বিক (Political theorist) ছিলেন। এই সর্বস্বত্যাগী অসামান্য দেশপ্রেমিককে ভারত কোন দিনই ভুলবে না।

৪৪.৭ অনুশীলনী

ক) জয়প্রকাশ রচিত সর্বোদয় ভিত্তিক গণতন্ত্র বিশ্লেষণ করুন।

খ) জয়প্রকাশ রচিত সর্বাত্মক বিপ্লব তত্ত্ব ব্যাখ্যা করুন।

গ) জয়প্রকাশকে কিভাবে ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক হিসাবে চিহ্নিত করা যায় ?

ঘ) জয়প্রকাশের কর্মজীবন ও চিন্তাধারায় সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন করুন।

৪৪.৮ গ্রন্থপঞ্জী

1. Allan Scarfe and Wendy Scarfe : "JP—His Biography" (New Delhi : Orient Longman, 1975).

2. Bimal Prasad ed. : "A Revolutionary's Quest" (Delhi, Bombay etc. : Oxford University Press, 1980).

3. Brahmanand ed. : "Towards Total Revolution", 4 vols. (Bombay : Popular Prakashan, 1978).

4. David Selbourne ed. : "In Theory and in Practice — Essays on the Politics of Jayaprakash Narayan" (Delhi : Oxford University Press, 1985).

5. Dennis Dalton : "The Ideology of Sarvodaya : Concepts of Politics and Power in Indian Political Thought" in "Political Thought in Modern India," ed. Pantham and Deutsch (New Delhi, Beverly Hills etc. : Sage, 1986).

6. Nitis Das Gupta : "The Social and Political Theory of Jayaprakash Narayan" (New Delhi : South Asian Publishers, 1997).

দ্রষ্টব্য, "Amrita Bazar Patrika", Calcutta, 17 July, 1977.

7. Jayaprakash Narayan : "A Plea for Reconstruction of the Indian Polity" (Varanasi : Akhil Bharat Sarva Seva Sangh, 1959, P. 80).

8. দ্রষ্টব্য Dennis Dalton : "The Ideology of Sarvodaya : Concepts of Politics and Power in Indian Political Thought."

একক ৪৫ □ মানবেন্দ্রনাথ রায়

গঠন

৪৫.০ উদ্দেশ্য
৪৫.১ প্রস্তাবনা
৪৫.২ প্রাথমিক পর্যায়
৪৫.৩ কমিন্টার্ন ও মানবেন্দ্রনাথ
৪৫.৩.১ লেনিন-রায় মতবিরোধ
৪৫.৪ মানবেন্দ্রনাথ ও ভারতীয় রাজনীতি
৪৫.৫ মার্ক্সবাদ ও মানবেন্দ্রনাথ
৪৫.৬ মানবেন্দ্রনাথ ও তাঁর নবমানবতাবাদ
৪৫.৭ দলহীন গণতন্ত্র
৪৫.৮ সারাংশ
৪৫.৯ অনুশীলনী
৪৫.১০ গ্রন্থপঞ্জী

৪৫.০ উদ্দেশ্য

ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে মানবেন্দ্রনাথ রায় (১৮৮৭ - ১৯৫৪) এক অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব। তিনি হ'লেন প্রথম তাত্ত্বিক যিনি মার্ক্সবাদী, যুক্তিবাদী ও বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতীয় রাজনীতি ও সমাজের গতিপ্রকৃতিকে বিশ্লেষণ করেছেন। বর্তমান এককে আমরা মানবেন্দ্রনাথের চিন্তাধারায় বিভিন্ন দিকের সঙ্গে পরিচিত হব ও সেই সঙ্গে ভারতীয় রাজনীতিতে তাঁর স্থান নির্ণয়েরও একটা চেষ্টা করব। এখানে আমরা যে যে বিষয়গুলির উপর আলোকপাত করব, সেগুলি হ'ল :

- মানবেন্দ্রনাথের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী
- তাঁর চিন্তাশীলতা উন্মেষের বিভিন্ন পর্যায়
- কমিন্টার্ন ও মানবেন্দ্রনাথ
- ভারতীয় রাজনীতি ও মানবেন্দ্রনাথ
- মার্ক্সবাদ ও মানবেন্দ্রনাথ
- দলহীন গণতন্ত্র প্রসঙ্গে মানবেন্দ্রনাথ
- নবমানবতাবাদ